দান্তে

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

সপ্তম শতাব্দীতে হজরত মহম্মদের নেতৃত্বে আরব জগতের যে-জাগরণ হয় তার অন্যতম ফলশ্রুতি পাশচাত্য সভ্যতা - সংস্কৃতির ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে উৎসাদন ও আল্পসের অপর পারে পুনর্বাসন। এর পরবর্তী কয়েক শত বছরের পাশচাত্য ইতিহাস এমন এক পর্যায়ে প্রবেশ করে যার বৈশিষ্ট্য ওই আল্পসের মতো অচলতা ও উর্ধ্বমুখিতা। এই অচলতার আর্থনীতিক তথা রাজনৈতিক রূপ হলো সামন্ততন্ত্র আর উর্ধ্বমুখিতার বা ধর্মীয় রূপ যাজকতন্ত্র।

পাশ্চাত্য সভ্যতা - সংস্কৃতির জন্ম ভূমধ্যসাগরের কোলে, তারই ঢেউয়ের দোলায় দোলায় শত বছর ধরে তা লালিত - পালিত; ভূমধ্যসাগরের জলে জাহাজ ভাসিয়ে তারা প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করত; আর মধ্যে মধ্যে ক্ষুধার্ত সিংহের থাবায় নিরস্ত্র মানুষের রক্তপাত ও মৃত্যু দেখে গগন বিদীর্ণ করত উল্লাসে। কিন্তু তারাই আবার নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে রইল যখন প্রাচ্য ও পাশচাত্যের মধ্যে ইসলামের অভ্যুত্থান হলো অনতিক্রম্য প্রাচীরের মতো। বৃহৎ বাণিজ্য বন্ধ হলে জমি চাষ করাই হয়ে ওঠে প্রধান জীবনকর্ম। সেসঙ্গে জমির মূল্য পরিবর্তিত হলো এবং সে-পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এমন এক জমিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হলো যার নাম সামন্ততন্ত্র।

বাহির্বিশ্বের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হওয়ার পরে ধারণা জন্মাল যে পায়ের নিচের জমিটুকু নিয়েই গোটা - পৃথিবী, এর উপরে স্বর্গ আর নিচে নরক। স্বর্গে বাস করেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, ত্রিলোকের অধিপতি। একবার স্বর্গে উপনীত হলে অন্তহীন সুখ ও শান্তি। কিন্তু ঈশ্বরের করুণা ব্যতীত সেখানে প্রবেশলাভ অসম্ভব। ঈশ্বরের করুণা থেকে বঞ্চিত হলে বা তাঁর কোপে পড়লে নরকে গিয়ে শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে তাদের যন্ত্রণায় ভাগ নিতে হয়। ইহলোক তো একটা পান্থশালা, এখানে দুটি দিন কাটিয়ে সবাইকেই যেতে হয় স্বর্গে অথবা নরকে। পরলোকই মানুষের গন্তব্যস্থল, তার চিরকালের আবাস। সাধারণত তারাই ঈশ্বরের করুণা থেকে বঞ্চিত হয় যারা পাপী, তবে সদাচারেও সর্বদা করুণা মেলে না। প্রকৃতপক্ষে কী ভাবে দৈনন্দিন জীবনযাপন করলে, কী কী আচার অনুষ্ঠান মানলে, কোন পথে ঈশ্বরের করুণা লাভ করা যায় তা বাতলে দিতে পারে ধর্মযাজকেরাই। অর্থাৎ তারাই ঈশ্বরের সঙ্গে মধ্যস্থতা করে। তাই গোটা মধ্যযুগ জুড়ে মধ্যস্থকারীর জয়জয়কার।

আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক অর্থে মধ্যযুগের ইউরোপ বলতে যেমন সামন্ততন্ত্র এমনই আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় অর্থে বোঝায় যাজকতন্ত্র—এমনভাবে দুটি পরস্পরের পরিপূরক যেন একটির গায়ে অপরটি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি তাস। প্রকৃত পক্ষে অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে লম্বার্ডদের পরাস্ত করে ইতালীতে যাজক - রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন শার্লেমান, যিনি তখনকার ভূস্বামীদের প্রধান ছিলেন; এবং তাঁর রোম পরিদর্শনকালে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর প্রধান - যাজক তৃতীয় লিয়ো শার্লেমানের মাথায় আকস্মিকভাবে সম্রাটের মুকুট পরিয়ে কৃতজ্ঞতা জানান যাজকদের তরফ থেকে। ছোট সামন্তের উপরে ন সামন্ত, তার উপরে মেজ সামন্ত— এইভাবে সামন্ততন্ত্র যেন এক অন্তহীন সোপানশ্রেমী। ছোটর সঙ্গে সেজর সম্পর্ক নয়ের মাধ্যমে, নয়ের সঙ্গে মেজর সম্পর্ক সেজর মাধ্যমে অর্থাৎ পিঠোপিঠি ছাড়া কারও সঙ্গে কারও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। আবার যাজকতন্ত্র সংগঠনের দিক থেকে ছিল সামন্ততন্ত্রের অনুরূপ।

উভয়ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের সম্পর্ক ছিল অটল, সুনির্দিষ্ট, স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত। সত্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, ভাগ্যবিপর্যয়ের আশঙ্কা কিংবা ভবিষ্যতের বিষয়ে উৎকন্ঠা অজ্ঞাত ছিল, বংশানুক্রমে অনুসৃত চিন্তা ও কর্মের ধারা পরিক্রমণেই সেকালের মানব জনম সার্থক। সাধারণ মানুষ ছিল বহুলাংশে পরিতুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। সেকালের পরিস্থিতি উচ্চাভিলাষীদের পক্ষেই বা এমন কী শ্বাসরোধী ছিল? সামাজিক স্তরক্রমে যাদের স্থান উচ্চে তারাই স্বভাবত উচ্চাভিলাষী। কিন্তু তারা নিশ্চয়ই বুঝত যে সমাজব্যবস্থার রূপান্তরে তাদের অবস্থান্তর অনিবার্য, সুতরাং স্থিতাবস্থাকে কায়েম করতেই ছিল তাদের ন্যস্ত স্বার্থ, তার সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের বিশেষ সুযোগ - সুবিধে।

যাজকদের যেসব অতিরিক্ত অধিকার ছিল তার মধ্যে একটি হলো, মধ্যযুগীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন (sauvete) অর্থাৎ গির্জা বা মঠকে ঘিরে অনেকখানি এলাকার পবিত্রতা রক্ষার নামে যাজকশাসন। সে সব স্থানে তীর্থযাত্রীরা, পায়ে হেঁটে দল বেঁধে যারা গাঁয়ে গাঁয়ে জিনিস বেচাকেনা করত সে সব ফিরিয়লা স্তরের ব্যবসায়ীরা, কিংবা ভবঘুরেরা পেত আসা - যাওয়ার পথে আশ্রয়। সেই সুবাদে এসব বসতিতে মধ্যে মধ্যে বাজার বসত যা কালে কালে নেয় স্থায়ী বাজারের রূপ। আবার কোনও কোনও যাজক-মোহন্ত সরাসরি ব্যবসাতে লিপ্ত ছিল। কখনও বা ভূস্বামীরাও নিজেদের সুবিধের জন্য নিজের নিজের এলাকাতে বাজার বসাত, আগন্তুকদের জন্য শিথিল করে দিত সামন্ততান্ত্রিক আইনের কঠিন বাঁধন, সেখানে অবরেসবরে বা দরকার পড়লে গিয়ে নিজেদের থাকবার ব্যবস্থাও রাখত, চারপাশে দেওয়ালও তুলত যাতে বিপদের দিনে প্রজাদের অন্তত কিছু অংশ সেখানে আশ্রয় পেতে পারে। বিশেষ করে সেকালের পদাতিক বণিকযুগের সাময়িক আড্ডা হিসেবে এসব জনপদ ক্রমে ক্রমে শহরে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য সব শহর যাজক-মোহান্ত বা সামন্তপ্রভুদের উদ্যোগে গড়ে ওঠেনি, অনেক শহর গড়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, বিভিন্ন বণিকযুথের প্রতীক্ষার বা বিশ্রামের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে।

একই সময় থেকে সেলজুক্ তুর্কীরা এশিয়ায় দারুণ পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। জেরুজালেম তো বটেই, মূল ইউরোপ ভূখণ্ডেরও অনেকখানি তাদের দখলে। এরপরেই তারা থাবা বাড়াবে কনস্তান্তিনপলে। তারপরে পশ্চিম ইউরোপের কাঁধে চেপে বসতে কতক্ষণ! সেবারে শার্লেমান ছিলেন ইউরোপের পরিত্রাতা, এবারে তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রধান - যাজক দ্বিতীয় উরবান। পরস্পর বিবদমান্ পাশচাত্যের সকল ভূস্বামীকে তিনি ডাক দিলেন খ্রীষ্টধর্মের নামে। ম্লেচ্ছদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে পবিত্র শহর জেরুজালেম। ইতালীর প্রজাতন্ত্রগুলো দেখল, প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের পথকে অবারিত করার এই তো মোক্ষম মওকা। ধর্মযুদ্ধের নামে তারা চলল বাণিজ্যসংগ্রামে। প্রথম তিনটিতে তাদের অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন থাকলেও চতুর্থ ধর্মযুদ্ধে তা এমন নির্লজ্জভাবে প্রকট হলো বা মধ্যযুগীয় পাশচাত্য ইতিহাসের সব চাইতে বড়ো কলঙ্ক। এদিকে যুদ্ধের খরচ তুলতে সামন্তপ্রভুরা করের বোঝা চাপিয়ে দিল প্রজাদের মাথায় আর সে - কর আদায় করতে শুরু করল অত্যাচার। ফল হলো উলটো। প্রজাদের মধ্যে জমি ছেড়ে পালাবার হিড়িক পড়ে গেল, বণিকদের দলে ভিড়ে তারাও নেমে পড়ল ব্যাবসাতে। যার জমিজমা নেই তার পক্ষে ব্যবসাতে নামাই তো স্বাভাবিক। ব্যবসায়ীদের ঘট্টস্থল হলো শহর। ওদিকে প্রাচীর সঙ্গে প্রতীচীর বাণিজ্যপথ খুলতে শুরু করেছে। ইতালী তার কেন্দ্রস্থল।

যারা তখনও চাষবাস নিয়ে আছে তাদেরও মন ছুটেছে বাণিজ্যে। শহরগুলোতে একসঙ্গে বাড়তে থাকল জনসংখ্যা ও বাণিজ্যিক তৎপরতা; এবং সেসঙ্গে কাঁচা টাকার আমদানী। শহুরে জীবন মানুষকে দিল স্বাধীনতা, বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য, নতুন সুখের সন্ধান। পরের দিন

ময়ূর পাওয়া যেতে পারে বলে কে-ই বা আজকের হাতের পায়রাটি উড়িয়ে দিতে চায়। সবার অলক্ষ্যে পরলোকের অনিশ্চিত প্রাপ্তির চাইতে ইহলোকের নিশ্চিত প্রাপ্তির পানে ইউরোপের চিত্ত দিনে দিনে উন্মুখ হয়ে উঠতে থাকল। পরপর কতগুলি ধর্মযুদ্ধের রক্তক্ষয়ে সামন্ততন্ত্র ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়ল। আর শহুরে জীবনের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে যাজকতন্ত্র হারাল তার পূর্বতন প্রতাপ।

জমির স্থাণুত্ব থেকে পুঁজির চাঞ্চল্যে, বাণিজ্যের পথে - পথে শহরের মুক্ত আবহাওয়াতে, নতুন মূল্যবোধে ও জীবনধারার পরিবর্তনে, কূপমণ্ডুকের দৃষ্টিকোণ ছেড়ে বৃহত্তর পৃথিবী সম্বন্ধে সচেতনায়, ঐহিক আগ্রহে, সমর্পিত বিশ্বাসের বদলে আপন ব্যক্তিত্বের মাপকাঠিতে সত্যের বিচারে, শাস্ত্রীয় ভাষার আধিপত্য অস্বীকার করে মাতৃভাষার সেবায়, আচার - সর্বস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দোর্দণ্ড অনুশাসনের বাইরে আধ্যাত্মিক অন্বেষণে পাশ্চাত্য ইতিহাস যখন সুস্পষ্টভাবে এক কালান্তরের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে তখন দান্তে অলিঘিয়েরির আবির্ভাব। তাঁর পেছনে প্রায় চার শর বছরের ইউরোপ : মধ্যযুগের ইউরোপ, আর সামনে বিপুল সম্ভাবনাতে অস্থির ইউরোপ: আধুনিক ইউরোপ। এই দুই ইউরোপের যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কারের দুঃসহ ও দুর্মর অভিযানে তাঁর জীবনকাহিনী রোমাঞ্চকর। অবশ্য সে-কাহিনীর পুঙ্খনুপুঙ্খ বাস্তব - বিবরণ জানবার উপায় আজ না থাকলেও আমরা পেয়েছি তার রূপক - বিবরণ,মানুষের অনুভাবনা কত ব্যাপক, অনুভূতি কত গভীর, কল্পনা কত উচ্চ হতে পারে তারই মহিমান্বিত সাক্ষ্য : ''ডিভাইন কমেডি"।

দান্তের জন্ম ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০মে, ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরে। তার অনেক আগে থেকেই সামন্ততন্ত্র আর যাজকতন্ত্রের মধ্যে বনিবনা ঘুচে তলায় তলায় একটা রেষারেষি শুরু হয়ে যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই রেশারেশির জের ইতালীতে টানল ওই দুটি তন্ত্রের সমর্থকবৃন্দ: প্রধান - সামন্তের পক্ষভুক্তদের বলা হতো ঘিবেল্‌লিন আর প্রধান - যাজকের পক্ষভুক্তদের গুয়েল্‌ফে। গৃহযুদ্ধে জর্জরিত ইতালীতে ঐক্যের শেষ আশার শিখাটি নিবে গেল ১২৫০ খ্রীস্টাবে সিরিলির রাজা বিশ্বের বিস্ময় দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের মৃত্যুতে ফ্লোরেন্সে যখন গুয়েল্‌ফর কতৃত্ব পেল তখন তাদের মধ্যেও আবার শ্বেত ও কৃষ্ণ নামে দুটি দলে ভাঙন ধরল। নাগরিক মেজাজে নবীন বণিকেরা হলো শ্বেতদল, ফ্ল্যোরেন্সের জন্যে তারা দাবি করল প্রধান যাজক বা সম্রাটের প্রভাবমুক্ত এক শক্তিশালী প্রজাতন্ত্র, কিন্তু কৃষ্ণদল আঁকড়ে রইল প্ধান - যাজকের প্রতি অনুগত্যের ভিত্তিতে গুয়েল্‌ফদের আদিতন আদর্শকে। দান্তে পরিবার ছিল শ্বেতদলের অন্তর্ভুক্ত এবং এসূত্রে স্বদেশীয় রাজনীতির উত্তাপ প্রথম যৌবন থেকেই তাঁকে বহুবার স্পর্শ করেছিল। ঘোড়ার পিঠে চড়ে সামনের সারিতে যুদ্ধ করতেও হয়েছিল তাঁকে। ছোটবেলাতে ছবি আঁকার দিকেও নাকি তাঁর বিলক্ষণ প্রবণতা ছিল। কিন্তু কাব্য ছিল তাঁর অস্তিত্বের সারাৎসার আর সে - কাব্যের প্রেরণা নারীর প্রতি প্রেম। নারী বলতে আদর্শ নারীত্ব নয়, নারী সম্পর্কে কোনও নির্বস্তুক কল্পনা নয়, একেবারে রক্তমাংসের বিশেষ নারী। অবশ্য বিয়াত্রিচেকে যখন দান্তে প্রথম দেখেন তখন তিনি আট - ন বছরের বালিকা। দান্তের বয়সও তখন ন-দশের বেশি নয়।

বাবার সঙ্গে দান্তে গিয়েছিলেন ফ্লোরেন্সের একজন বিশিষ্ট নাগরিকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখতে। সেখানেই নিমন্ত্রণ কর্তার মেয়ে বিয়াত্রিচেকে তিনি প্রথম দেখেন। প্রথম দর্শনের সেই ছবিখানি তাঁর মনে চিরকালের জন্যে ছাপা হয়ে গিয়েছিল। নয়নাভিরাম লাল পোশাকে বালিকা বিয়াত্রিচেকে দেখে বালক দান্তের বুক কেঁপে উঠল, মনে হলো যে তাঁর চাইতে অনেক বেশি শক্তি ধরে এরকম কোনও দিব্যসত্তা যেন, তাঁকে চালাবার জন্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দান্তে নিজেই বলেছেন যে তাঁদের এ-প্রণয় বিবাহসাপেক্ষ ছিল না, বিয়াত্রিচেকে একান্ত নিজের করে পাওয়ার আকঙ্ক্ষাও কখনও তাঁর জাগেনি। বিয়াত্রিচের অন্যত্রে বিয়ে হয়ে গেলেও একাধিকবার তাঁদের দেখা হয়। দান্তের যখন আঠারো বছর বয়স তখন একদিন পথে বিয়াত্রিচে তাঁকে দেখতে পেয়ে সম্ভাষণ জানান। সে সম্ভাষণকে দান্তের মনে হলো স্বর্গীয় উন্মীলন। কদিন পরে আবার তাঁদের দেখা হলো এক বাড়ির ভোজসভায়। সেদিন বিয়াত্রিচেকে দেখে দান্তে এমন আবিষ্ট হন যে তাঁর বন্ধু ভেবেছিলেন, বুঝি বা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু বিয়াত্রিচে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীতা হলেন তখনই ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলো।

দান্তের মনে হলো আকাশ থেকে সমস্ত আলো কেউ মুছে নিয়েছে, ফ্লোরেন্স যেন এক দারুণ শ্মশান। প্রিয়তমার অকাল মৃত্যু দান্তের মনে হানল কোন্ রহস্যময় অভিঘাত। সেই তাঁর নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হলো। তিনি চার বছরের মধ্যে প্রকাশ করলেন ''নিউ - লাইফ" নামে একত্রিশটি কবিতার সংকলন, সঙ্গে গদ্যে লেখা কবিতাগুলি সম্পর্কে রচয়িতার মন্তব্য। আসলে সেগুলো শ্লোকে রূপান্তরিত বিয়াত্রিচের জন্যে তাঁর অনবদ্য শোক : পঁচিশ বছরের বেশি যে নারীকে মানবসমাজ ধরে রাখেতে পারেনি তাঁকে নিরবধি কাল ধরে রাখার প্রতিশ্রুতি। সেই একত্রিশটি রচনাতে দান্তের লৌকিক প্রেম পেল এক আলৌকিক রূপ: বিয়াত্রিচে সাধারণ নারী নন, তাঁর মধ্যেই মূর্ত হয়েছে খ্রীস্টীয় উন্মীলন। প্রিয়তমার মৃত্যু দান্তেকে দিল নতুন জন্ম, নতুন জীবন, নতুন দৃষ্টি। মর্তের বিচ্ছেদের আড়ালে তিনি দর্শন করলেন স্বর্গীয় মিলন। কিন্তু সে মিলনের জন্যে যাত্রা করার আগে যে তাঁকে এক মর্তের ঋণ চুকিয়ে যেতে হবে।

অতঃপর দান্তে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়লেন স্বদেশের রাজনীতিতে। এক বছরের মধ্যে হলেন শ্বেতদলের মুখ্যনেতাদের অন্যতম। এই সময় পরিবারের নির্বন্ধে বিয়ে করলেন। পরিবারের কর্তা হিসেবে সামাজিক কর্তব্যে অবহেলা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দান্তের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল কি না নিশ্চিত করে বলা কঠিন, তবে কন্যার নাম রেখেছিলেন বিয়াত্রিচে। তিনি স্বভাবতই আত্মমুখী ছিলেন। রাজনৈতিক নেতাদের অন্যতম হিসেবে তাঁকে নানা ধরনের চিন্তা ও কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো। ফলে সংসারের ব্যাপারে বিশেষ সময় দিতে পারতেন বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক কাজ আরও বেড়ে যায় ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে ছ জন সদস্য নিয়ে গঠিত ফ্লোরেন্সের তৎকালীন শাসক-সংস্থার একজন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পরে। ইতিমধ্যে শ্বেত ও কৃষ্ণ গুয়েলফদের মধ্যে নতুন করে এক বিরোধের সূত্রপাত হয়। তার মূলে ছিল শ্বেতদলের অন্তর্ভুক্ত এক পরিবারের কৃষ্ণদলের অন্তর্ভুক্ত এক পরিবারের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিবাদ। অচিরেই সেই বিবাদ ফ্লোরেন্সের পথে পথে সশস্ত্র দাঙ্গার রূপ নেয়। কৃষ্ণদল তলে তলে ব্যবস্থা করতে লাগল যাতে প্রধান - যাজকের নির্দেশক্রমে ফ্রান্সের তৎকালীন রাজার ভাই ফ্লোরেন্সে শান্তি - প্রতিষ্ঠাতা রূপে হাজির হয়। শ্বেতদলের প্রতিনিধি করে দান্তেকে পাঠানো হলো প্রধান - যাজক সপ্তম বোনিফেসের কাছে। সপ্তম বোনিফেস বরাবরই অসন্তুষ্ট ছিলেন ফ্লোরেন্সের শ্বেতদলের উপরে। তিনি নিজেও জানতেন যে কৃষ্ণদল যদি ক্ষমতাতে আসে তবে সেটা তাঁরই লাভ।

সেই যে সপ্তম বোনিফেসের সঙ্গে দেখা করে স্বদেশের সমস্যার একটা ফয়শালা করবেন বলে দান্তে ফ্লোরেন্সের মাটি থেকে পা তুললেন তারপরে আর কোনদিনই সেখানে পা ফেলতে পারেননি। সপ্তম বোনিফেস ছিলেন অসাধারণ উচ্চাভিলাষী, ধনলিপ্সু, পণ্ডিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং দান্তের বিবেচনায় খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত যাবতীয় কুকীর্তির এক বিপুল বিগ্রহ। উভয়ের বিবেচনায় সাক্ষাতের কোনও যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু দান্তের অনুপস্থিতকালে ১৩০১ -এর সর্বসন্ত - দিবসে ফ্রান্সের রাজভ্রাতা নিরপেক্ষ শান্তি - সংস্থাপক রূপে উপস্থিত হলেন ফ্লোরেন্সের দরজায় এবং শহরে ঢুকেই কৃষ্ণদলের পক্ষ নিলেন, তারপরে শ্বেতদলের সমর্থকদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে বসলেন পাঁচ দিন ব্যাপী এক মচ্ছবে। দান্তে ও আরও চারজনকে জালিয়াতি, দুর্নীতি ও প্রধান - যাজক, ফ্রান্সের রাজা, গুয়েলফ দল ও ফ্লোরেন্সের শান্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্যে তলব করলেন। ১৩০২ এর - ২৭

জানুয়ারি অভিযুক্তদের উপর জরিমানা ও দু বছরের নির্বাসন এবং ১০ মার্চ কঠোরতর হুকুমে দেওয়া হলো চির - নির্বাসনের দণ্ড : ফিরে এলে অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত দাহ করা হবে। ''ডিভাইন কমেডি''র জন্যে সারা ইউরোপে নাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে তাঁকে ফ্লোরেন্সে ফিরে আসার জন্য ডাকা হয়, কিন্তু তার শর্তাদি ছিল অসম্মানজনক। নির্বাসনের উনিশটি বছর একেবারে কপর্দক শূন্য ভিখারীর দশাতে, এ-শহর থেকে ও-শহরে বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে ঘুরে, বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে, গুণগ্রাহীদের সৌজন্যে কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও লজ্জানিবারণ করে কাটিয়ে দেন দান্তে। অপরের রুটির স্বাদ যে কটু অপরের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করাটা যে আয়ুর ধ্বংসকীট এই মর্মান্তিক সত্যের উপলব্ধিতে ১৩২১ -এ তাঁর মৃত্যু হয় র‍্যাভেনাতে, সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। কয়েক শতাব্দী ধরে দান্তের দেহাবশেষ মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্যে ফ্লোরেন্সবাসীদের আন্তরিক বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আজও তা র‍্যাভেনাতেহ আছে।

নির্বাসনটা ছিল দান্তের কাছে শাপে বর। যদি জোর করে তাঁকে স্বদেশের রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে অপসারণ করা না হতো তবে কি স্বর্গীয় মিলনের জন্যে তাঁর পক্ষে যাত্রা করা সম্ভব হতো? পর্বতের শিখরে আরোহণের সময় যেমন বোঝা হালকা করে নিতে হয় তেমনই স্বর্গে গমনের সময় মর্তের দায়। যদি রাজনীতির সঙ্গে দিব্যতার সন্ধানকে মেলাতে চাইতেন তাহলে হয়তো দু ক্ষেত্রেই ঘটত একাগ্রতার অভাব। তখন স্বর্গীয় মিলনের বদলে তিনি হয়তো লিখতেন ভৌতিক বিচ্ছেদের কাহিনী। আর তা হতো খাঁচায় পোষা পাখির বেদনার্ত গান। কমেডির বিপরীত ট্রাজেডি। কৃষ্ণদল তাঁকে নির্বাসন দিয়ে দাঁড়ের শিকল কেটে দিল। ছাড়া পেয়েই উড়ল আলোর ইশারা দেখে দেখে। খানিক দূরে উড়ে পাখির খেয়াল হলো, পায়ে এখনও শিকল পরানোর আংটাটা লেগে আছে। তাই দান্তে ''অনে মনার্কি'' নামে একখানি বই লিখলেন।

এই ছোট বইখানিতে দান্তে দাবি তুললেন যে ঐহিক ও পারত্রিক ক্ষেত্রের সম্পর্ক হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন দুটি রাষ্ট্রের মতো, কেউ কারও বিষয়ে একেবারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং আপন আপন ক্ষেত্রে সম্রাট ও প্রধান-যাজক হবেন আরও শক্তিমান, জনসাধারণের উপরে তাদের কর্তৃত্ব হবে স্বতঃসিদ্ধ। সাধারণ মানুষও মধ্যযুগে মেনে নিয়েছিল যে চিরন্তন তথা পারত্রিক বিষয়ে ধর্মযাজকদের আর ঐকাহিক তথা ঐহিক্য বিষয়ে সামন্তপ্রভুদের অধিকার। যাজকশ্রেণীর সর্বোচ্চ স্তরে মহামান্য প্রধান - যাজকের ও সামন্তদের সর্বোচ্চ স্তরে সম্রাটের অধিষ্ঠান। একজনের বিপদ সীমা অপরজনের পক্ষে দৃঢ় অর্থে মেনে চলা সম্ভব সর্বদা হতো না। পারত্রিক প্রসঙ্গে প্রধান - যাজকের সর্বময় কর্তত্ব স্বীকারে সম্রাট অকুণ্ঠ, কিন্তু প্রধান - যাজক কর্তৃক স্থাপিত পবিত্র কিরীট এবং প্রধান যাজক কর্তৃক অভিষিক্ত না হলে কারো সম্রাটত্ব বৈধ হতে পারে না। এর থেকে এল দুটি কৃপাণের বিসংবাদ। ১০৭৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যানোসাতে প্রধান - যাজক সপ্তম গ্রেগরি যেভাবে লাঞ্ছিত করেন সম্রাট চতুর্থ হেনরিকে তা ঐহিক কৃপাণের উপরে পারত্রিক কৃপাণের প্রাধান্যের পরাকাষ্ঠা। তারপর থেকে নতুন নতুন আর্থনীতিক ও সামাজিক শক্তির উত্থানে গির্জার প্রতিপত্তিতে ভাঁটা পড়ে।

কিন্তু দ্বি-কৃপাণের দ্বন্দ্বের দরুণ ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছিল আর নিজেকে ভেঙে ভেঙে তার সবচাইতে চড়া মাশুল দিতে হয়েছিল ইতালীকে। দান্তে ব্যক্তিগত ভাবেও কম যন্ত্রণা ভোগ করেননি—তাঁর নির্বাসনের মূলেও ওই দ্বন্দ্ব পরোক্ষ ছিল। সেজন্যে তিনি খুব জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন—যে পৃথিবীর যাবতীয় অশুভ ঘটনার পেছনে অধ্যাত্মবাদীদের ঐহিক্য লালসা সবচাইতে বড়ো কারণ। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিয়া হলো মননচর্চা আর স্বদেশের দুর্দশা দেখে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে তার প্রকৃত বাধা হলো যুদ্ধবিগ্রহ। তাই রাজনীতির অদ্বিতীয় লক্ষ্য শান্তিস্থাপনা। কিন্তু দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি কখনও পাশাপাশি থাকতে পারে না, অথবা দুটি শক্তি যদি একই কর্তত্বের জন্যে লোলুপ হয়ে ওঠে তাহলেও অশান্তি অনিবার্য। একমাত্র সুরাহা হলো সমগ্র পৃথিবীতে একটিমাত্র সরকার ও একটিমাত্র শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং পার্থিব সকল বিষয়ের দায়িত্ব সেই সরকারের হাতে সমর্পণ করা, পক্ষান্তরে যাদের সাধ্য পরলোক তাদের সমস্ত অভিনিবেশ থাকবে মৃত্যুর পরেকার জীবনের প্রতি। মর্তের জীবন যে-ব্যবস্থার দ্বারা শাসিত হবে তার নাম বিশ্বজনীন রাজতন্ত্র, কেননা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখেছিলেন যে প্রজাতন্ত্রে এমন অনেকের হাতে প্রভুত্ব আসে যারা অযোগ্য, রাষ্ট্রশাসনের সুযোগ ব্যক্তিগত সৌভাগ্য ও স্বার্থের সন্ধানী, রাষ্ট্রশাসনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

''অন মনার্কি'' বইখানি লেখার অনেক আগেই দান্তে লেখা শুরু করে দিয়েছিলেন

নিদ্রাভঙ্গে দেখি, জীবনের মধ্যপথে
অসাধ্য দিগ্‌খেদ ভয়ঙ্কর মহাবনে,
সংক্ষিপ্ত সরণি লুপ্ত কৃষ্ণ ভবিষ্যতে।

তারপর নিরয়লোক ও শোধনলোকের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত জটিল অয়নে স্বর্গলোকের উদ্দেশে তাঁরা যাত্রা। ঈশ্বরের সন্নিধানে উপনীত হওয়ার কোনও সুগম সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ নেই। নরকের পথ তো শুধুই উৎরাই, তারপর থেকে স্বর্গের অন্তিম প্রান্ত পর্যন্ত সমস্তটাই চড়াই। ''অন মনার্কি'' লেখার পরে মর্তের দায় কাঁধ থেকে নামিয়ে চড়াইয়ের পথে দান্তের যাত্রা হলো অপেক্ষাকৃত অনায়াসে সম্পাদ্য। শোধনলোক পর্যন্ত দান্তেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন ভার্জিল, যিনি একাধারে দান্তের কাব্যগুরু ও তৎকালীন পার্থিব প্রজ্ঞার প্রতীক। তারপরে স্বর্গে উপনীত হওয়ার পরে পথ দেখালেন বিয়াত্রিচে।

কিন্তু যে - মিলন মর্তে হলো না তা যে স্বর্গে সম্ভব এ প্রত্যয় কোথা থেকে পেলেন দান্তে? ব্যর্থ প্রেমে স্বভাবতই মানুষ সান্ত্বনা খোঁজে পরলোকের সার্থকতাতে। অথচ স্বর্গীয় মিলনের জন্য পথের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাবলীর এমন বিশদ ও সুসমঞ্জস বর্ণনা তিনি দিয়েছেন যা কোনও নিতান্ত সান্ত্বনা- সন্ধানীর পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। ছায়াচ্ছন্ন পাতালের পথে ঈনীজের কাছে ডিডোর আগমনের কথা রোমের জাতীয় মহাকাব্য ঈনীডের ষষ্ঠ পর্বে ভার্জিল উল্লেখ করেছেন। হয়তো তার থেকেই দান্তেও বিশ্বাস করেছিলেন যে বিয়াত্রিচের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে স্বর্গে, তাঁরই সহায়তায় জানতে পারবেন ঈশ্বরের রহস্যময় মহিমাকে। প্রাচীন পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংস্কৃতির যোগ্যতম উত্তরাধিকারী ছিলেন ভার্জিল এবং ঈনীডের পাতালে অবতরণের প্ররোচনা তিনি পেয়েছিলেন আবার গ্রীক পুরাণের হেরাক্লেস, অডিসিউস ও প্রিয়তমাকে উদ্ধারের জন্য অরফিউসের পাতালে অভিযানের কাহিনী থেকে। অর্থাৎ পারত্রিক প্রয়াণের কল্পনায় দান্তে পরোক্ষে ধ্রুপদী গ্রীক চেতনারও উত্তরাধিকারী। তার উপরে মধ্যযুগের আলো - বাতাসেই ছিল পরলোকের প্রতি অটল প্রত্যয় : খ্রীস্টধর্মালম্বীদের মধ্যে প্রথম যুগে হেরমাসের ধর্মযাজক, ভবিষ্যৎ - দর্শী - পিটার প্রভৃতির আর মধ্যযুগে মন্টে ক্যাসিনোর অ্যালবেরিক, ইভশ্যমের মোহান্ত প্রভৃতির অলৌকিক অভিজ্ঞতাগুলিও নিঃসন্দেহে দান্তের পারত্রিক কল্পনাকে পরিপুষ্ট করেছিল।

যীশুখ্রীষ্ট কর্তৃক প্রচারিত ধর্মের পাশ্চাত্য চেতনার সঙ্গে মহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মের আরব্য চেতনার সঙ্গম দান্তের উপলব্ধিতে এক বিপুল মোহনা সৃষ্টি করে থাকতে পারে। এ-ক্ষেত্রে যোগাযোগটা কতখানি আকস্মিক বা কতখানি স্বেচ্ছাকৃত তা বলা কঠিন, কেননা এই যোগাযোগের স্বরূপ সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানে পাশ্চাত্য অনীহা এতদিন পরে নতুন করে গবেষণার পথকে প্রায় প্রতিরুদ্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং অনুমতির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্যগতি নেই।

মৃত্যুর ওপারে কী আছে তার জিজ্ঞাসাতে যেমন মিশরীয়রা, যেমন হিন্দুরা আক্রান্ত, তেমনই মুসলমানরাও; পরলোকে মহম্মদের

পবিত্র প্রয়াণের যে কাহিনী দশম শতাব্দীতে আবুল - আল অল্ - মায় 'আরি বিবৃত করেন তা প্রায় দু শতাব্দীর পরে স্পেনের পরমজ্ঞানী ও মরমী ঈব্‌ন্ আর - অবি কতৃক দুটি পর্যায়ে পুনকথিত হয়। এবং আর্ - অবির মৃত্যুর মাত্র পঁচিশ বছর পরেহ দান্তের জন্ম। প্রধান - যাজক চতুর্থ নিকোলাস যাঁর পাণ্ডিত্যে অভিভূত হয়েছিলেন সেই অর্ডার অব্ মার্সির সাধু ও জেয়ঁর যাজক সন্ত পিটার প্যাসচলের রচনাতেও পাওয়া যায় মহম্মদের ওই যাত্রার বিস্তর উদ্ধৃতিযোগে সশ্রদ্ধ উল্লেখ; ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে দান্তের দেশত্যাগের সমকালে তিনি যখন মুরদের হাতে শহীদ হন তখন স্পেনের ও সম্ভবত ইতালীকে নিয়ে সমগ্র পশ্চিমের সারস্বত সমাজে তাঁর বিবরণ বহুল প্রচারিত। সে - বিবরণের উল্লিখিত শিরাট আসলে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে সংযোগকারী একটি দুরতিক্রম্য সেতু এবং তা পার হওয়ায় সময় সকল আত্মাকেই সাবধানে টাল সামলে চলতে হয়। এই শিরাটের খ্রীস্টীয় সংস্করণ দান্তের শোধনলোক কিনা, নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কিন্তু এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই যে দান্তে প্রথম যৌবনে ছিলেন ব্রুনেত্তো লাতিনির অনুসারক ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাতে ধন্য তরুণ কবি; নরকে উভয়ের সাক্ষাৎ - কালে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক যে কত ওতপ্রোত ছিল তার পরিচয় স্বয়ং দান্তেই দিয়েছেন। যেকালে ব্রনেত্তো স্পেনে গিয়েছিলেন কোবিদ অ্যালফনসর সভাতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে তখন সেখানে আরব্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে ব্রুনেত্তো যে গভীর শ্রদ্ধা জাগিয়েছিলেন তার বহুতর সাক্ষ্য ''ডিভাইন কমেডি''তে সুলভ। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের এই সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ধর্মযুদ্ধগুলোর ফলে। ঠিক কথা যে খ্রীস্টীয় ধর্মযোদ্ধারা প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির সন্ধান পায়নি, তাদের পরিচয় প্রধানত হয়েছিল মরুভূমির সন্তানদের সঙ্গে। তবু সেই সীমিত পরিচয়ের সূত্র ধরে আরবদের চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, গণিত ও বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের অনুবাদ পশ্চিম ইউরোপে জাগল অভূতপূর্ব আলোড়ন। অর্থাৎ দান্তের পক্ষে মহম্মদের দিব্য অভিযানের কাহিনীর সম্বন্ধে সাক্ষাৎরূপে অবহিত হওয়ার অবকাশ ছিল প্রচুর।

দান্তের এই অবধানের প্রকৃতি বোঝা সহজ হবে যদি ইব্‌ন্ আর - অবির কাহিনীর সঙ্গে ''ডিভাইন কমেডি'' সদৃশতা সম্বন্ধে কিছু মূর্ত নিদর্শন পাশা - পাশি উদ্ধার করা যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে : মহম্মদ ও দান্তের যে -অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণিত হয়েছে তার সমস্তই এই মর্তের পরপারে সংঘটিত; দুজনেরই যাত্রাশুরু নিশাকালে; মহম্মদের পথ আগলে থেকেছে একটা সিংহ ও একটা নেকড়ে আর দান্তের বেলাতে একটা চিতা বাঘ, একটা সিংহ ও একটি স্ত্রী - নেকড়ে; পথ প্রদর্শনে ছায়ামূর্তিদের কিংবা জিনগোষ্ঠীর প্রধান খয়টুরের ভূমিকা ''ডিভাইন কমেডি''তে পালন করেছেন অশরীরী ভার্জিল এবং তিনি ইতালীর ধ্রুপদী সংস্কৃতির প্রধান - পুরুষ। প্রাথমিক সাদৃশ্যের পরে আরও অগ্রসর হলে দেখা যায় যে দুটি কাহিনীতেই নরকের নিকটবর্তী লক্ষণগুলি হলো বিহ্বলকারী বিশৃঙ্খল ধ্বনিঝঞ্ঝা, অগ্ন্যুৎপাত ও বিস্ফোরণ এবং নরকের আকৃতি প্রতিক্রান্ত শঙ্কুর মতো ও পাতকীরা শ্রেণীবিশেষে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। নিরয়লোকের পরে শোধনলোকের কল্পনা আরব্য কাহিনীতে অস্পষ্ট হলেও স্বর্গের বিবরণ আবার দুটি কাহিনীতে পরস্পরের অনুরূপ : ঈশ্বরের নিকটবর্তী হলে মহম্মদের থেকে গ্যাব্রিয়েল ও দান্তের থেকে বিয়াত্রিচে পেছনে সরে গেছেন; দিব্যরহস্যের গোলাপকুঞ্জ দুটি কাহিনীতেই উল্লিখিত; আবার আরব্য কাহিনীর অতিকায় মোরগের ইতালীর বিকল্প স্বর্গীয় ঈগল। জেরুজালেম থেকে মহম্মদ সোপান বেয়ে উচ্চতম স্বর্গে আর শনিগ্রহ থেকে দান্তে সুবর্ণ সোপান বেয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে দেবত্ব লাভ করেছেন। উভয় কাহিনীতেই দিব্যবিভা বিচ্ছুরক অগণিত দেবদূতের ন-টি সমকেন্দ্র মণ্ডল পরিবৃত অত্যুজ্জল আলোকে ঈশ্বর - দর্শন বণিত হয়েছে এবং তার দরুন মহম্মদ ও দান্তে উভয়েরই আশু - ও - বিলম্বিত - প্রতিক্রিয়া একাত্মক : ধন্দকারী আলোকে প্রথমে ভেবেছেন বুঝি-বা তাঁরা অন্ধ হয়ে গেছেন, ক্রমে সাহস সঞ্চয় করে সেই আলৌকিক দৃশ্যের প্রতি চক্ষু বিবন্ধ করেছেন, তারপরেই তাঁদের সমাধিলাভ।

তাছাড়া নাহজাম নামে হব্‌ন্ আর্ - অবিরও একজন প্রেমিকা ছিলেন যার উদ্দেশে নিবেদিত গূঢ়তত্ত্বের কবিতাগুলি নিয়ে কুৎসা ওঠে, তখন তিনি প্রতিবাদে বাধ্য হয়ে বলেন যে ওগুলির সঙ্গে স্পর্শগ্রাহ্য প্রেমের কোনও সম্পর্ক নেই, ''কেননা হৃদয়ে আছে যে প্রতিমা নব নব প্রত্যেক সাক্ষাতে তার রূপ বৃদ্ধি পায় বৈচিত্র্যে, মহত্ত্বে।'' আর ''নিউ লাইফ'' এর রচনাবলী নিয়েও সেকালে প্রশ্ন উঠেছিল এবং দান্তে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে নতুন জীবনের নায়িকাকে এমন মর্যাদা দেবেন যা সাধারণ নারীর জন্যে অবাস্তব; ওই প্রতিজ্ঞার রূপায়ণে ''ডিভাইন কমেডি'' সম্ভব হলো, কিন্তু প্রতিজ্ঞাটির— পেছনে আর্ - অবির কৈফিয়ৎ আদৌ উদ্বোধক দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করেছে কিনা বলা কঠিন, তবে যেবাবে উত্তরণের ও স্বর্গের নিকটবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দান্তের প্রেম প্রবল থেকে প্রবলতর ও অধ্যাত্মদৃষ্টি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে এক শ বছর আগে আর্-অবি কর্তৃক প্রদত্ত কৈফিয়তের স্মৃতিবহ।

অবশ্য পাহাড়ের মাথায় সূর্যকে লক্ষ্য করে এগুনোর সোজা পথে চিতা বাঘ, সিংহ ও স্ত্রী নেকড়ের রূপক প্রাচীন খ্রীস্টীয় ধর্মগ্রন্থের অন্তর্গত ভবিষ্যদ্বক্ত জিরেমিয়া অংশ থেকে আহরণ করা দান্তের পক্ষে সম্ভব এবং আরব্য কাহিনীর এ -প্রসঙ্গটি যে একই উৎস থেকে প্রবাহিত হয়নি তা বাজিয়ে রেখে বলা যায় না। তাছাড়া আরব্য কাহিনীর পক্ষে নরকে পাতকীদের নানা স্তরে সাজাবার জন্যে অ্যারিস্টটলের কাছ থেকে ঋণ করার কল্পনা কি একেবারেই বাতুলতা ? আরব বিশ্বে তো অ্যারিস্টটলের চর্চা নবম শতাব্দীতেই শুরু হয়ে যায় আবু ইয়ুসুফ ইয়াকুব ইব্‌ন্ ইশাক আল -কিন্দর ঘটকালীতে। রক্ষণশীল মুসলিমদের নির্যাতন ও বিরোধিতা সত্ত্বেও সে -চর্চা বিস্তারে লাভ করতে থাকে আর দশম শতাব্দীর শেষে ও একাদশ শতাব্দীর শুরুতে তার চরম বিকাশ হয় আলেপ্পোর বাদশাহ সয়েফ-আল্ - দৌলাহ্-র সভাসদ আবু নশর্ মহম্মদ আল - ফবাবির অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর ব্যাখ্যান; এবং কারও কারও বিবেচনাতে তিনিই হলেন অ্যারিস্টটলীয় অনুধ্যানের দ্বিতীয় গুরু। মনে হয় মহম্মদের শিষ্যগণ শুধু অ্যারিস্টটলের কাছে ঋণই করেননি, যেকালে ইউরোপ অ্যারিস্টটলের নাম প্রায় মুছে ফেলেছিল তখন তাঁকে অক্ষত অবস্থাতে রক্ষা করে মধ্যযুগের শেষপাতে ইউরোপের হাতে সঁপে দিয়ে সে - ঋণ শোধও করেছেন। স্কলাস্টিসিজিমের প্রবক্তাগণ - কৃত লাতিন অনুবাদে অ্যারিস্টটলের অন্যতম বিকৃতি হলো পাপের মাত্র দুটি পর্যায়ে বিভাগঃ ব্যাভিচার ও অহিতেচ্ছা। ব্যভিচার মানে ইন্দ্রিয় - পরায়ণতা, ঔদরিকতা, অর্থগৃধ্নুতা ও ক্রোধ; আর অহিতেচ্ছা মানে পাশবপীড়ন, সরল অহিতেচ্ছা, ও প্রবঞ্চনামূলক অহিতেচ্ছা। কিন্তু অ্যারিস্টটল সুস্পষ্টভাবে ধর্ষণ বা পশ্চাচারকে নির্দেশ করেছেন অহিতেচ্ছার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে ও সেটাকে বলেছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের পাপ।

দান্তে যদি ইব্‌ন সিনা - কৃত অ্যারিস্টটলের আরবী অনুবাদের বিপর্যস্ত লাতিন অনুবাদকেই অনুসরণ করে থাকবেন তাহলে কেমন করে তাঁর পক্ষে মূলক্রমে তিনটি পর্যায়ে পাতক বিভাগ করা সম্ভব হলো ?

অবশ্য অ্যারিস্টটল কর্তৃক নির্দিষ্ট তিন পর্যায়ে সাত প্রকার পাবের বিভাগ নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেননি, তার সঙ্গে যোগ করেছেন স্বীকৃত ধর্মে অবিশ্বাস ও ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যাকরণকে এবং এ-দুটি ছিল মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য চেতনার নিদান অনুসারী পাপ: কেননা যেখানে দৃঢ়নিবন্ধ ধর্ম - সংহিতার ভিত্তিতে দেশীয় সংবিতের উন্মেষ হয় সেখানে—যেমন মুসলমান আরবে বা খ্রীস্টীয় ইউরোপে— এ রূপ পাপচিন্তা অনিবার্য। উল্লিখিত ন প্রকার পাপের সঙ্গে দান্তে আবার জুড়েছেন আপন অভিজ্ঞতাপ্রসূত অতিরিক্ত এক প্রকার পাপ: সুবিধাবাদ বা হজুগেপনা। প্রথম সাত প্রকারকে আদিতন বা প্রাচীন যুগীয় আর পরের দু প্রকারকে মধ্যযুগীয় বললে দান্তে নিজস্ব অবদানটিকে বলা যায় আধুনিক যুগীয় পাপ।

অতিরিক্ত দশম পাতটিকে বাদ দিলে কারও কারও সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে দান্তের কল্পনাতে মৌলিকতার বিলক্ষণ অনটন ছিল; একথা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো যে মৌলিকতা বলতে আজকাল যা বুঝি তার উদ্দাম প্রকাশ ''ডিভাইন কমেডি'' তে আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য, এবং ওই কাব্য প্রকৃতপক্ষে কুন্তিলকতার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন, যেমন শেক্সপীয়র অথবা গ্যোটে কিংবা রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী। পরম্পরায় ঘটনা অবিরাম উদ্ভাবনে নয়, কোনও মহান তত্ত্বের প্রজননে ও প্রচারে নয়, স্বদেশের ও স্বকালের বিকীর্ণ বিচূর্ণ বিস্রস্ত লৌকিক চেতনাকে সুগভীর সুবিন্যস্ত সুসম্বন্ধ অলৌকিক আধারে ধারণেই তাঁদের প্রতিভার অনন্যতা, পূর্ববর্তীদের উত্তরাধিকার পরবর্তী প্রজন্মগুলিকে প্রদানেই তাঁদের দুর্ধর্ষ কল্পনার দুঃসাহসিক অভিযানের যাথার্থ্য, অনাগত কালের অজ্ঞেয় অন্ধকারে অতীতের অলোকসম্পাতেই তাঁদের কীর্তি সম্যক সর্বজনীন তাৎপর্যে মহৎ।

মধ্যযুগের খোলস ফাটিয়ে ইউরোপের লৌকিক চেতনা যখন সবে আধুনিক যুগের পানে উন্মুখ যে সময় ''ডিভাইন কমেডি'' লেখা হয় অর্থাৎ তার রস প্রাচীন যুগের আর আলোবাতাস আধুনিক যুগের হলেও মাটি কিন্তু মধ্যযুগের; এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপের সারাৎসার খ্রীস্টধর্মীয় সংবিত, যার মূল প্রত্যয় হলো পিতা পুত্র পরমাত্মা নিয়ে ত্রিতয় ঈশ্বরের কল্পনা। এজন্যে তিন সংখ্যাটি দান্তের ধ্যানে প্রধান প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত: ''ডিভাইন কমেডি'' তিনি রচনা করেছেন এমন কৌশলে যাতে সর্বদা অখণ্ড অথচ খণ্ডখণ্ড রূপে নিদেন তিনটি মাত্রা গ্রন্থটির থাকে এবং স্থূল অর্থে এই তিনটিকে নির্মিতি বা গঠনরীতি সম্বন্ধীয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শীর্ষলেখে বিচার করা যায়।

''ডিভাইন কমেডি''র জন্যে দান্তে যে-ছন্দ আবিষ্কার করেন তা তিনপদ বিশিষ্ট স্তবকের সুদৃঢ় অন্তর্গ্রন্থনে প্রবাহিত এবং তা তেরজা রিমা নামে বিখ্যাত; এ -কাব্য যাঁরা মূলত ইতালীর ভাষাতে পড়েছেন তাঁদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে এই বৃহৎ গ্রন্থের ছন্দস্পন্দন সর্বত্রই শুধু অবধারিত নয়, তার কোনখানে নাকি ছন্দের খাতিরে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়নি যাকে বাহুল্য বলে বাতিল বা শিথিল করে বদল করা চলে। প্রতিটি স্তবকের মতোই সমগ্র কাব্য আবার নিরয়লোক, শোধনলোক ও স্বর্গলোক অনুসারে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত; প্রথম সর্গটিকে প্রস্তাবনা রূপে গণনা করলে প্রতি খণ্ডের সর্গসংখ্যা দাঁড়ায় পাশাপাশি দুটি-তিন-বসানো তেত্রিশ অর্থাৎ তিন খণ্ডের সর্গসংখ্যা তিন তেত্রিশে নিরানব্বুই ও সেসঙ্গে প্রস্তাবনা জুড়ে মোট একশ। মূল তিনটি পর্যায়াশ্রয়ী সাত প্রকার, সেসঙ্গে মধ্যযুগের দু প্রকার, অর্থাৎ ন প্রকার আর দান্তে নির্ণীত অতিরিক্ত এক প্রকার, অর্থাৎ সাকুল্যে দশ প্রকার পাতক অনুসারে নরকের যেমন দশটি স্তরভাগ করা হয়েছে তেমনই শোধনলোক ও স্বর্গলোকও দশটি করে স্তরে বিভক্ত; এবং প্রতি খণ্ডের এই মোট স্তরসংখ্যা দ্বারা আবার সমগ্র কাব্যের মোট সর্গসংখ্যা বিভাজ্য।

দান্তের গঠনরীতি যে কতখানি সুপরিকল্পিত তা পশ্চাদোদ্ভাসনের প্রক্রিয়াতে অধিকতর অর্থপূর্ণ বিস্তার পেয়েছে, কেননা এই বই পড়তে পড়তে যতই এগুনো যায় ততই পেছনে - ফেলে - আসা বিভিন্ন উল্লেখের মর্ম স্পষ্টতর হয় : অ্যাকেরন নদী পার করে নরকে পৌঁছে দেয় কারোন এবং ক্ষণিকের জন্যে সে পাঠকের অভিনিবেশে এতই হালকা একটা দাগ কাটে যা অচিরেই মুছে যায়, কিন্তু পরে যখন নরক থেকে দেবদূত - কর্ণধার যাত্রীদের পৌঁছে দেয় শোধনলোক তখন ধরাপড়ে যে কারোনের দাগ সত্যি - সত্যি মুছে যায়নি, অন্যান্য অভিজ্ঞতাতে চাপা পড়ে গিয়েছি মাত্র ও দেবদূত - কর্ণধারের প্রসঙ্গে সেগুলো সরে গিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে কারোনের দাগটিকে, এবং তখনই ধরা পড়ে যে কারোন বা দেবদূত কেউই স্বয়ংসাধিত নয়, বরং তারা একে যে অপরের পরিপূরক, পারস্পরিক সম্পর্কেই তারা এমন এক তাৎপর্যের সমর্থন পায় যা পরিচ্ছন্ন অস্তিত্বে তাদের বঞ্চনা করে; তেমনই যে-প্রান্তে নরকের নিম্নতমস্থলীতে অনন্ত তিমিরের শটিত তুহিন পূতিপঙ্কে বীভৎস ত্রিরূপী শয়তানের স্থিতি, তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশ বিরুদ্ধ গুণান্বিত ঈশ্বরের বাস। প্রকৃতপক্ষে ''ডিভাইন কমেডি''র রূপকল্প এমন সুদৃঢ় শৃঙ্খলাতে সংগঠিত যে তার মধ্যে প্রসঙ্গ একই সঙ্গে পরম অনিবার্য ও সুসমঞ্জস অন্যোন্যসম্বন্ধে অনেকান্ত অর্থে আলোকিত এবং সেসবের ক্রমাগত বিশ্লেষণে অন্ত পাওয়া দায়।

অথচ আপাতচোখে দান্তের বিশ্ব নিপট সরল : এ বিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবী, তাকে ঘিরে চন্দ্র বুধ শুক্রু সূর্য মঙ্গল বৃহস্পতি শনি স্থির - নক্ষত্রপুঞ্জ ও আদিশক্তির ন টি সমকেন্দ্র মণ্ডল ঘূর্ণিত হচ্ছে এবং এই ন টি মণ্ডলকে আবৃত করে রেখেছে যে - পবিত্র আলোকে যেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি বা সেই আলোকই ঈশ্বর, ফলে সমগ্র সৃষ্টির বিদ্যমানতা ঈশ্বরের দ্বারা বিধৃত; আবার পৃথিবী যেমন এই বৃত্তমালার কেন্দ্র তেমনই পৃথিবীর কেন্দ্র হলো নরকের অন্তিম বিন্দু। স্বভাবতই পরিধির থেকে সেই চূড়ান্ত কেন্দ্রবিন্দুর দূরতা সর্বাধিক এবং সেই বিন্দুতেই শয়তানকে স্থাপন করেছেন দান্তে, অর্থাৎ এই বিশ্বের স্থাপত্যটাই যেন যথার্থ মূল্যবোধের মাপকাঠি—পরিধির বা ঈশ্বরের থেকে কার কতখানি ব্যবধান শুধু সেটুকু অনুসারে সহজেই নির্ধারণ করা যায় তার পাপের গুরুতা বা লঘুতা।

এই মাপকাঠিতে দান্তে সন্ধ্যবহার অসাধারণ মিতব্যয়িতা রক্ষা কাজে, কেননা যখনই তিনি ত্রিলোকের মানচিত্রের কোনখানে আঙুল রেখে সেখানের দৃশ্য বর্ণনা করেছেন তখনই স্বতঃক্রিয়াতে নির্ধারিত হয়েছে আলোচ্য প্রসঙ্গের মূল্যায়ন ও প্রকৃতি : নরকের মাপকাঠিতে ইন্দ্রিয়দোষীর স্থান সর্বোচ্চের অব্যবহিত পরে আর তার শাস্তি অন্ধকার ঘূর্ণাবাত্যার অবিরাম আঘাত এবং এর সিদ্ধান্ত এই যে যেহেতু প্রেম পবিত্র মানসিক অবস্থা হলেও অতিরিক্ত দেহপ্রেম ঈশ্বরের অনুভূতিকে ভোঁতা ও প্রজ্ঞাকে প্রবৃত্তির বলি করে তাই পাতক হিসেবে ল্যাম্পট্য সর্বাপেক্ষা লঘু আর তা প্রকৃতি হলো অসংযত সংরাগের কৃষ্ণঝঞ্ঝাতে আবর্তন।

''ডিভাইন কমেডি'' থেকে বিশ্বের গ্রথন সম্বন্ধে যে-নক্শাটি কল্পনা করা যায় তা দ্বিতীয় শতাব্দীর মিশরীয় জ্যোতির্বিদ ক্লডিয়াস টোলেমেউস বিরচিত হলেও বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে অচেতন ও মানুষে মানুষে নির্দিষ্ট অটল যথাক্রম, স্তরে স্তরে আনুপূর্ব সুরক্ষিত সম্পর্কে বিশিষ্ট মধ্যযুগীয় ইউরোপের প্রতিফল; যেখানে জন্ম আচরণ জীবিকা সামাজিক স্থিতি জীবনের লক্ষ্য পারলৌকিক গতি অর্থাৎ মানুষের সমস্ত কিছুই পূর্বনির্ধারিত এবং প্রতিটি বিভাগ প্রতিটির থেকে সুস্পষ্ট রেখায় স্বতন্ত্র অথচ প্রতিটির সঙ্গে প্রতিটির ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্ন ও অপরাহত।

মধ্যযুগের মানুষ এই জগৎ ও সংসারের যে - রূপ অবধান করেছিল ও তার যে-স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করেছিল তাকে পরবর্তীকালের বিজ্ঞান অলীক প্রতিপন্ন করেছে, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিশ্বের প্রতিটি পৃথক পৃথক অংশের মধ্যে নির্বিকল্প ও নিশ্চিত সম্পর্কের তথা কাজে জীবনটার একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল, এবং সে-লক্ষ্যের মহিমা সম্বন্ধে তাদের মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না। সাধারণভাবে মধ্যযুগীয় জীবনোপলব্ধির মধ্যেই ''ডিভাইন কমেডি''র পরিকল্পনা করেছিলেন দান্তে অর্থাৎ তিনি শুরুতেই স্থির করে নেন যে মধ্যযুগীর পাশ্চাত্য সার্বিক বিশ্বন্ধর-ঋত সত্ত্বকে কোথাও স্পষ্টত লঙ্ঘন করবেন না, বরং তাকে গ্রহণ করবেন ষোল আনাতে। সুতরাং নিরয়লোকে অবতরণ করে স্বর্গের পথে তাঁকে শোধনলোকে আরোহণ করতে হলো; আর স্বয়ং ঈশ্বরের করুণা ও দর্শন লাভ করা ছাড়া তাঁর এই যাত্রার অন্য কোনও উদ্দেশ্যই থাকতে পারে না। অবশ্য এই ঈশ্বরও সর্বজনীন নন, তিনি একান্তভাবে খ্রীস্টীয় ঈশ্বর এবং তাঁর অনুভূতি সর্বতোরূপে অতীন্দ্রিয়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এই অনুভূতির স্বর্গীয় প্রান্তে যেমন পিতা পুত্র ও পরমাত্মার সম্মিলিত তেমনই মর্তীয় প্রানে হয়েছে পরম - পিতার

সঙ্গে তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখ্রীষ্টের একাত্মকরণ। ঈশ্বরের ত্রিত্বের কথা স্পষ্ট করে নরকের দরজার মাথায় উৎকীর্ণ করে দান্তে ক্ষান্ত হননি, শেষ পর্যন্ত নানা উপলক্ষ্যে কথাটি অসংখ্যবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পাঠককে, এমনকি কাব্যের আধারটিতেও ওই ত্রিত্বের প্রত্যাভাস। আদিতে খ্রীস্টানদের বিশ্বাস ছিল যে প্রসত্তা (Spiration) এমনভাবে প্রগণের (generation) অন্তহীন অনুবন্ধী অভিব্যক্তি যে উৎসের অঙ্গীকারেই স্রোতের যাথার্থ্য বা একটি অপরটি সনাতন স্বীকৃতি : নবীন খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থের সময় থেকে প্রগণ ও প্রসন্তার স্তান নেয় যথাক্রমে পিতা ও পুত্রের রূপ এবং এদের মধ্যে প্রবাহিত প্রেম পেল তৃতীয় একটি রূপ : আদ্যাভিলাষ রূপান্তরিত হলো পবিত্র প্রাণবায়ুর (Spiritus sanctus) কল্পনাতে, যা পিতা দিচ্ছে পুত্রকে আবার পুত্র দিচ্ছে পিতাকে এবং কালক্রমে প্রাণবায়ু পেল পবিত্র আত্মার বা পরমাত্মার রূপ। পক্ষান্তরে মর্তীয় প্রান্তে কুমারী মেরীর কাছে ২৫ মার্চ গ্যাব্রিয়াল কর্তৃক ঘোষণা করা হয় যে তাঁর গর্ভে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের আবির্ভাব হবে : মানবীর গর্ভে দেব ধারণ করে ঈশা লাভ করলেন মানবের গুণাবলী অর্থাৎ তিনি একই অঙ্গে ঈশ-প্রকৃতি ও নর - রকৃতির সমন্বিত রূপ; এবং যীশু খ্রীস্টের সঙ্গে যেমন মনুষ্যসত্তা তেমনই, মেরীর সঙ্গে মনুষ্যদেহ সর্বপ্রথম স্বদেশ প্রবেশ পায়।

পরলোককে কেন্দ্র করে মধ্যযুগীয় ইউরোপে যে - মানব জীবন আবর্তিত হতো তার পরম আস্পৃহা ছিল স্বর্গে প্রবেশ - লাভ। কিন্তু স্বর্গে প্রবেশের পরেও দান্তের কামনা নিঃশেষ হয়নি। তখন বিয়াত্রিচে তাঁকে নিয়ে গেলেন ঈশ্বরের সন্নিধানে। প্রেমের কাছে মানুষের অন্তহীন দাবি। এত দূর এসে ঈশ্বরের দর্শন থেকে কি বঞ্চিত থাকা যায়? তিনিই তো প্রেমস্বরূপ। ঈশ্বর দর্শনের জন্যে দান্তের মনোবাঞ্ছাও পূরণ করা হলো। কিন্তু ঈশ্বরের ত্রিতয় - রূপ-দর্শনের কোনও বর্ণনা কবি দেননি, বলা উচিত, দিতে পারেননি, যেহেতু মর - ভাষাতে তা অবর্ণনীয় : সমস্তটা যেন দৃষ্টির সম্মুখে দ্রবমান তুষারের মতো, মর্মরিত শিহরিত পত্রগুচ্ছের উপরে উড্ডীন সিবিলের ভবিষ্যদ্বানীর মতো বিলীন হয়ে গেল, রইল শুধু কোনও দিব্যস্বপ্নের অসহ্য আনন্দপূর্ণ স্মৃতি। সেসঙ্গে তিনি অনুভব করেছেন বিশ্ব - সংসারের অখণ্ডতা ও পরিপূর্ণতা আর তার মধ্যে অন্তর্নিহিত এক অমোঘ ছন্দ - শৃঙ্খলা।

ঈশ্বরের রূপ না হয় অবর্ণনীয়, কিন্তু তাঁর অনুভূমি কী রূপ? তিনি কি আলোকময় মঙ্গলময় সর্বগুণসম্পন্ন সর্বশক্তিমান? না, দান্তের ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে ঈশ্বরই স্বয়ং আলো ও মঙ্গল, সর্বগুণ ও সর্বশক্তি। পৃথিবীর অন্য সমস্ত আলোক মঙ্গল গুণ শক্তি ঈশ্বরের থেকে উৎসারিত, তাঁকে ঋণ করে ঋদ্ধ। এর মধ্যে আলোক সবচাইতে সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য, তাই পাহাড়ের মাথায় আলোর ইশারা দেখে অন্ধকার অরণ্যের উদভ্রান্ত দান্তের যাত্রা শুরু। এই আলোক হলো ঈশ্বরের প্রেম। কিন্তু প্রেমের পথ জটিল। সেজন্যে অভিযাত্রীর প্রজ্ঞা থাকা চাই। দান্তের প্রজ্ঞা তাঁর গুরু ভার্জিল। তিনি স্বর্গ পর্যন্ত শিষ্যকে এগিয়ে দিয়েই খালাস। স্বর্গ যে প্রেমের রাজ্য। তাই সে-রাজ্যে দান্তেকে পথ দেখালেন তাঁর মর্তের প্রেমনীয়া বিয়াত্রিচে। ঈশ্বরের এই প্রেমের হেতু কী? দুধ কেন ঘোল না হয়ে দুধই হলো এ-প্রশ্নের যেমন জবাব নেই তেমনই ঈশ্বরের প্রেমের হেতুসন্ধানও অনর্থক। প্রেমের জন্যেই প্রেম। স্রষ্টার প্রেম প্রতীক্ষা করে থাকে সৃষ্টির মধ্যে তার প্রতিফলনের জন্যে। স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির আকর্ষণের মূলেও প্রেম। ঈশ্বরের প্রেমধন্য দান্তের যখন আর - কিছু চাইবার থাকল না তখনই সমাপ্ত হলো ''ডিভাইন কমেডি''।

দান্তেকে যাঁরা ঈশ্বরের সকাশে পথ দেখিয়েছেন তাঁরা কেউ যাজক-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন: একজন ভার্জিল, একজন বিয়াত্রিচে এবং মাতা মেরীর কাছে দান্তের হয়ে যিনি প্রার্থনা করেছেন তিনি সন্ত বের্নহার্ড। অথচ সে-যুগে খ্রীস্টীয় ধর্ম - প্রতিষ্ঠান দাবি করেছিল, যে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মধ্যস্থতা করার আমমোক্তারনামা নাকি শুধু যাজকেরই আছে, আর আমীর থেকে ফকির অবধি কারও উপরে সে অধিকার খাটাতে তাঁরা কসুরও করেননি। এটা ভাবা ভুল যে ওই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপীড়িত হওয়ার দরুণ দান্তে পাল্টা - হাত নিয়েছেন অধিকাংশ যাজক ও ধর্মযাজককে নরকের শাস্তি দিয়ে; আসলে আনুষ্ঠানিক বাহ্য ধর্মাচরণের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ আস্থাহীন ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের মধ্যে সৃষ্টির স্থিতি, তাঁর করুণা পাওয়ার উপায় হলো বাইরের সাধনা তুলে নিয়ে ভিতরের সাধনা অর্থাৎ নিজের অন্তরের মধ্যে প্রসারিত অয়নে যাত্রা করা : সেজন্যে সহজেই ম্যাগডেবুগের মেখ্‌টিল্ড বা ''এটার্ণাল গোসপেল'' -প্রণেতা মোহান্ত য়োয়াখিম্ প্রমুখ মরমী সাধিকা- সাধকের স্বর্গীয় সমান - কল্পনা করেছেন; এবং সেজন্যে -নিজেও বাইরের সোজা - পথে পাহাড়ের মাথায় উঠতে গিয়ে চিতাবাঘ, সিংহ ও স্ত্রী - নেকড়ের তাড়া খেয়ে অবশেষে ভার্জিলের সঙ্গে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ঘুরে পথে এগিয়েছেন একই লক্ষ্যের পানে।

স্বর্গের দরজা পর্যন্ত দান্তেকে এগিয়ে দিয়ে ভার্জিল আর যেতে পারলেন না, তাঁর পরে পবিত্র আলোক পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন, বিয়াত্রিচে। এগিয়ে দিয়ে মর্তকায়াতেই যিনি ঈশ্বরদর্শন পেয়েছিলেন সেই সন্ত বের্নহার্ডকে অনুরোধ করলেন দান্তের অভিলাষ পূর্ণ করে দেওয়ার জন্য। বিয়াত্রিচে যেন সব অবস্থাতে তাঁকে ত্রাণ করেন এবং বিয়াত্রিচের প্রেমের যোগ্য যেন তিনি হতে পারেন এই প্রার্থনা করে দান্তে নিলেন বেহহাড়ের সঙ্গ। কিন্তু দান্তের সম্মুখে দর্শন দেওয়ার জন্যে ঈশ্বরকে অনুরোধ করার অধিকার বের্নহার্ডেরও নেই, তা আছে একমাত্র মাতা মেরীর, যিনি মানবের জন্যে একদা ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। যেহেতু ঈশ্বরের দর্শনলাভের মতো অলৌকিক প্রত্যাশা প্রকাশের ভাষা নশ্বর মানুষের নেই তাই দান্তের হয়ে প্রার্থনা করলেন সন্ত বের্নহার্ড।

> কুমারী জননী, আপন পুত্রের কন্যা,
> বিনীতা : মহতী তাবৎ জীবের থেকে,
> চিরপূর্ণতার ধ্রুবলক্ষ্য তুমি ধন্যা।

প্রথম পংক্তির মাত্র ছটি শব্দে মেরীতত্ত্ব বর্ণিত : মরি যদিও কুমারী তবু জননী ; যে-ঈশ্বর রক্তমাংসে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন সেই ঈশ্বরকেই তিনি জন্ম দিয়েছেন রক্তকাংসে, তাই তিনি যার কন্যা তিনিই তার পুত্র। দ্বিতীয় পংক্তির ছটি শব্দে মেরীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে : সাপের চাতুরিতে আদিনারী যে ভুল করেছিল তারই দরুণ মানুষ স্বর্গ হারায় ও সেই পতিত মানববংশের সন্তান বলে মেরী বিনীতা; কিন্তু সেসঙ্গে মহতীও বটে, কেননা মনুষ্যদেহে তিনিই এলেন স্বর্গে। তৃতীয় পংক্তির চারটি শব্দের মুক্তির পূর্ণতত্ত্ব বিকশিত : ঈশ্বর স্থির করেছিলেন মানবকে তাঁর মূল আবাসে ফিরিয়ে আনবেন স্বয়ং এবং মেরীর মধ্যে দিয়ে যেমন ঈশ্বর হলেন মানবতার শামিল তেমনই মেরীর মধ্যে দিয়েই মানবের ঐশিকতা লাভ সম্ভব এবং সমগ্র মানবের ঐশিকতা লাভের জন্যে মেরীই একমাত্র মাধ্যম।

এসব কাহিনী একালে অন্যান্য ধর্মালম্বীদের মনে তো বটেই, অনেক খ্রীস্টানদের মনেও বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে না; প্রকৃতপক্ষে ''ডিভাইন কমেডি''কে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া একান্তই অপলাপী: মনে রাখা দরকার যে ওই কাব্যের অনেকান্ত তাৎপর্যের উপরে দান্তে স্বয়ং গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ওটি রূপকের প্রচ্ছদের সত্যের জন্যে মানবের চিরন্তন অভিলাষের কাহিনী। হিন্দুর যেমন শুভাশুভের দ্বন্দ্বকে চণ্ডী কর্তৃক মহিষাসুর বধের মধ্যে কল্পনা করেছেন এখানে রূপক বলতে তেমন কোনও বির্মূত প্রসঙ্গ বুঝলে ভুল করা হবে, কেননা দান্তের রূপক - কল্পনার অভ্যন্তর - ভাগ বহুবিধ প্রতীকে সমৃদ্ধ, তা বিস্তর স্বতঃসিদ্ধ রূপে মুক্তিধাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনীতে উন্মত্ত স্বৈরাচারের সবস্তুক রূপ হিটলার— সে কাহিনীতে অশুভশক্তিকে বোধগম্য করার জন্যে কোনও ভয়ঙ্কর - দর্শন দানবীয় জীবের কল্পনার অর্থহীনতার মতো দান্তে বিভিন্ন গুণ ও পাপ ও পুণ্যকে বোঝাবার জন্যে বাস্তবের থেকে নিঃসম্পর্ক কতগুলি

চরিত্র ও তাদের রূপ উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াতে মূলত পরিহার করেছেন এবং তার পরিবর্তে প্রাসঙ্গিক পাপের অথবা পুণ্যের আধার হিসেবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছেন ইতিহাস বা ইতিহাসের শামিল ইতিকথা পুরাণ ইত্যাদির থেকে : নিরয়লোক ও শোধনলোকে পথ প্রদর্শণের জন্যে মানবিক প্রজ্ঞার কোনও অভিনব আকৃতির কল্পনা না করে সে-দায় দিয়েছেন ভার্জিলকে, কেননা মানবিক প্রজ্ঞা যে বার্জিলের মধ্যে বিশেষ রূপ প্রকাশ পেয়েছিল তা দান্তে কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণসাপেক্ষ থাকেনি, এবং ভার্জিলের মতো ''ডিভাইন কমেডি''র অধিকাংশ চরিত্রেরই স্বভাব স্বতঃস্বীকৃত।

চণ্ডী কর্তৃক অসুর হননের কাহিনী যতখানি ভাবমূলক কৃষ্ণের ব্রজলীলা ততখানি নয়, বরং তা বহুলাংশে বস্তুমূলক; ভিন্নধর্মাবলম্বীর কাছে নিত্যব্রজর কল্পনা দুঃসাধ্য হলেও পরম বৈষ্ণবের কাছে যতটা সত্য একজন খ্রীস্টানের কাছে মেরী ও ঈশার কাহিনী ততটাই বাস্তব, এবং দুটি কাহিনীই ইতিহাস ইতিকথা পুরাণের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় ইউরোপের সন্তান দান্তের কাছে ঈশা ছিলেন প্রকৃতই ঈশ্বরের পুত্র বা ঐশীসত্তার জীবন্ত মূর্তি এবং মেরী ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট মর্তের একজন নারী কিন্তু এমন একজন নারী যাঁকে নিমিত্ত করে ঐশীসত্তা ধারণ করেছিল রক্তমাংসের মানবিক রূপ। এখানে বিশেষ বিবেচ্য এই যে মধ্যযুগের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করেও দান্তে অলক্ষ্যে তার থেকে সরে গেছেন : মেরীর মধ্যস্থতা করার অধিকারে এমন এক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যা সামন্ততন্ত্র ও যাজকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ছিল, ওই দুটি তন্ত্র বিলুপ্ত হওয়ার পরেও আছে কিন্তু ঐতিহাসিক অর্থে মধ্যযুগের ইউরোপে অদৃশ্য। এইখানে তাঁর পদক্ষেপ আধুনিকতার পথে।

যেকালে জ্ঞানচর্চার একমাত্র ভাষা ছিল লাতিন এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতর মতো যা ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নিকট বোধগম্য শাস্ত্রীয় ভাষা তখন দান্তে ভাষার শুচিতা সম্পর্কিত মধ্যযুগীয় সংস্কারকে ''অন ভার্ণাকুলার'' নিবন্ধে শুধু যে আক্রমণ করলেন তা-ই নয়, যে-ভাষায় ইতালীর আপামর জনসাধারণের স্বত্ত্ব স্বীকৃত, যে-ভাষা শ্রবণমাত্র স্ত্রী-পুরুষ শিক্ষিত - অশিক্ষিত নির্বিশেষের বোধগম্য সেই ইতালীয়তে স্বয়ং দেশবাসীকে তথা বিশ্ববাসীকে পরিবেশন করলেন তাঁর পাণ্ডিত্য প্রজ্ঞা মুক্তির পরমোপলব্ধি এবং সে সঙ্গে তাবৎ শাস্ত্রীয় ভাষার পাশে এক কোটিতে প্রতিষ্ঠা করলেন মাতৃভাষার মর্যাদাকে।

''ডিভাইন কমেডি'' রচিত হওয়ার এক শ বছরের মধ্যে ইতালীতে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মতো আর অপর একটি লক্ষণ নব্যরাজতন্ত্রের সহায়তা সামন্ততান্ত্রিক অরাজকতার ও যাজকতান্ত্রিক কপট অধ্যাত্মসাধনার অবসান : পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে মেকিয়াভেলিকে গণ্য করা হয় আধুনিক রাজনীতির শুরু হিসেবে, কিন্তু পর্ববিভাগের সীমানাকে শিথিল করে পঞ্চদশ শতাব্দীর বদলে চতুর্দশ শতাব্দীকে আধুনিকতার শুরু ধরলে সে-আসন দান্তের প্রাপ্য; অবশ্য মেকিয়াভেলি রাজাকে সিংহের মতো বলীয়ান ও শৃগালের মতো ধূর্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং রাজনীতি ব্যাপারটাকে এঁকেছেন যথাসাধ্য কলঙ্কিত কূটব্যবসায় করে, এবং, আমরা সবাই জানি যে তাঁর বক্তব্য যত অপ্রিয় হোক -না কেন তা অকাট্য। পক্ষান্তরে দান্তে রাজনৈতিক জীবনের সম্বন্ধে যে-ধারণা পোষণ করতেন তা একান্তই আদর্শগত এবং সেখানে টমাস মোরের ''ইউটোপিয়া''র সঙ্গে তার সাদৃশ্য সবিশেষ আন্তরিক : সরকারের শাসনাধিকার দৈহিক শক্তিতে অথবা জাতিগত শ্রেষ্ঠতাতে জন্মায় না, তা জন্মায় আইনের প্রতি শাসকের সর্বাত্মক আনুগত্যে; ঠিক কথা যে ধরিত্রীর অদ্বিতীয় কর্তা বা রাজাকে হতে হবে সিংহের মতো বলীয়ান, কেননা আইন প্রয়োগের শক্তি থাকাও আর পক্ষে আবশ্যিক; কিন্তু পাছে বিশ্বজনীন রাজতন্ত্র শক্তির অপব্যবহারে সর্বজনীন স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয় তাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য থাকবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা গির্জা যার কাজ হবে সরাসরি রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করে রাজা ও রাজকর্মচারীদের পরম প্রজ্ঞাবান ও সত্যকাম করে তোলা যাতে তারা আপনা থেকে সকল দুষ্কর্মে শৈথিল্যে ও স্বেচ্ছাচারে নিবৃত্ত হয় এবং তাদের কর্তব্য হবে বিশ্বরাষ্ট্রে প্রতিজনে জনে সুখ ও শান্তির বিধান করা আর ওই কর্তব্যবোধে তারা হবে জনসাধারণের বিশ্বস্ত সেবক।

মাতৃভাষার মর্যাদা সম্বন্ধে মধ্যযুগের ইউরোপকে যিনি সচেতন করে তুলেছিলেন, যিনি বলেছিলেন রাজতন্ত্রের তুলনাতে যাজকতন্ত্র অর্বাচীন এবং সন্ত পল পর্যন্ত ছিলেন রাজার সাহায্যপ্রার্থী, যিনি বলেছিলেন রাজা ঐহিক ক্ষেত্রে ও যাজক পারত্রিক ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা, তাঁর স্থান স্বতঃক্রিয়াতে ও সুস্পষ্টরূপে নব্য রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতাতে পরিপুষ্ট পঞ্চদশ - ষোড়শ শতাব্দীর পাশ্চাত্য নব জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ রূপে সুনির্দীত হয়ে যায়। কিন্তু যে মানবিকতা ওই মহান জাগরণের মূলাধার তার আলোকে ঈশ্বরের স্বরূপ ও মেরীর মানবীয় রূপের অনন্ত দিব্যতার বিষয়েও দান্তের উপলব্ধি অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং বোধকরি সে - তাৎপর্য আরও গভীর; আবার ওই তাৎপর্যের পশ্চাদোদ্ভাসনে যখন স্বর্গলোক খণ্ডের একাদশ সর্গ বোঝার চেষ্টা করি—যেখানে দান্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সূর্যের মতো আবিভূত আসিসি - নিবাসী সন্ত ফ্রানসিসের সঙ্গে সঙ্গে বৎসরেরও অধিক অনাহূতা ও উপেক্ষিতা ওই নারীর পুনর্বিবাহের উপরে— তখন দান্তেকে দেখি কঠোর ধর্মসংস্কারকরূপে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্যে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞান ও মানবিকতাবাদ, আভিজাত্য ও সহজিয়া - সাধনা, খ্রীস্টীয় প্রত্যয় ও ধর্মসংস্কারবোধ বা প্রাতিস্বিক - ধর্মবোধ নিপট জটিলতায় সমন্বিত হয়েছিল।

আদি - নারী ঈভের ভুলে মানুষে যে স্বর্গীয় উদ্যানের অধিকার হারিয়েছিল যে-কথা মনে রেখে মধ্যযুগের যাজকগণ খ্রীস্টান জগতে প্রচার করেছিলেন তীব্র নারীদ্বেষ; কিন্তু দান্তে দুর্বলের প্রতি সবলের তথা মানুষের প্রতি ঈশ্বরের দায়, (miscecordia) সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ (pietate ও উদারতা বা মহত্ত্ব (maginificenza) দ্বারা মেরীকে ভূষিতা করেও ক্ষান্ত হলেন না, তিনি বিয়াত্রিচেকেও এই কাব্যে উপস্থাপন করেছেন পরম উন্মীলন রূপে। অথচ কে এই বিয়াত্রিচে? তিনি তো মর্তের একজন সাধারণ নারী মাত্র। তাঁর অলোকসামান্যতার মূলে কী? প্রেম। প্রত্যেক সাধারণ প্রেমিকের চোখে তার প্রিয়তমা এক অনন্যা স্বর্গীয় সুষমা, সেটুকুর ভিত্তিতেই মরলোকের নারী বিয়াত্রিচের অমরত্ব। পার্থক্য শুধু এই যে তিনি ছিলেন দান্তের মতো অলোক - সামান্য কবির প্রিয়তমা। যে - কালে নারীকে বর্ণনা করা হতো নরকের দ্বার বলে তখন দান্তের দৃষ্টিভঙ্গি বৈপ্লবিক এবং তাঁর নারী -বন্দনা গূঢ়তর অর্থে নতুন যুগের আবাহন।

এ-কথা ঠিক যে মধ্যযুগের অন্তিম পর্বে নারী সম্পর্কিত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন শুরু হয়েছিল : রাজা আর্থার ও গোলাপের উপকথাগুলিতে দেখা যায় কৃতী সেনাদের শিভালরস সমস্ত কীর্তির পেছনে নারীর বিচিত্র প্রেরণা, অসাধ্য সাধন করার মূলে নারীকে জয় করার বাসনা; কিন্তু মেনে নেওয়াই ভালো যে ওসব উপাখ্যানে রিরংসার একটা বড়ো রকমের ভূমিকা ছিল, এবং সার্ভেন্টিস সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই পাচিকা ডুলসিনীয়ার উদ্দেশে ডন কুইকসোটের অভিযানে দেখেছেন কারুণ্য ও কৌতুক। একদিকে মধ্যযুগীয় মরমী ক্রবাদুর কবিদের কিংবা আমাদের আরও কাছের রাধা - সাধক বাউলদের সহজিয়া কল্পনাসাধ্য এবং যা একই সঙ্গে সাযুজ্য পেয়েছে গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমোপলব্ধিতে! আদর্শ সৌন্দর্য, আদর্শ করুণা আদর্শ মহত্ত্ব— দান্তের চেতনাতে যা কিছু আদর্শ ছিল সমস্তই বিয়াত্রিচেকে অবলম্বন করে বিকশিত; অর্থাৎ বিয়াত্রিচের পরম জ্ঞান বা অমরতাতে উপনীত হওয়ার একমাত্র সূত্র। উপনীত হওয়া আয়ত্ত করা নয়, দর্শন করা, পরম জ্ঞানের স্বাদ গ্রহণ করা, অনন্ত সমুদ্রে গিয়ে নদী মেশে, তবু নদী কখনও সমুদ্র হয় না, তেমনই ওই প্রবাহ শুধু এক অনন্ত প্রক্রিয়া।

বাস্তব জীবনে দান্তের প্রেমে কতখানি সাড়া বিয়াত্রিচে দিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। ''নিউ লাইফ'' পর্যায়ের

কাব্যমালাতে তাঁদের প্রেমের যেটুকু কাহিনী পাওয়া যায় সেটুকুই আমাদের প্রধান সম্বল"। কাহিনীর বাদবাকি অংশ কিংবদন্তীর সামিল। দান্তের জবানবন্দী থেকে জানতে পাই যে বিয়াত্রিচেকে চোখে দেখেই দান্তের হৃদয় দিব্য আহ্লাদে ভরে যেত, মনে হতো কেউ যেন তাঁকে স্বর্গে টেনে তুলছেন। কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় না এর কতটা বাস্তব ও কতটা কাব্যিক সত্য। ''ডিভাইন কমেডি"তে গহন অরণ্যের থেকে উদ্‌ভ্রান্ত দান্তেকে উদ্ধার করে নরকের পথে যাওয়ার সময় ভার্জিল বলেছেন যে বিয়াত্রিচে কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হয়েছেন নন্দনবাসিনীর প্রেমিককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। অর্থাৎ বিয়াত্রিচের কামনাতেই দান্তের স্বর্গে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। তারপর দান্তেকে পরম জ্ঞান ঈশ্বরের সন্নিধানে পৌঁছে দিয়েছেন স্বয়ং বিয়াত্রিচে।

মর্তের পাতকী দান্তের স্বর্গে পৌঁছনো কেমন করে সম্ভব হলো? শুধুই প্রেমের জোরে? প্রেম কি ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে উলটে দিয়ে পাতকীকে স্বর্গে উত্তীর্ণ করে? প্রেম নরকের ভয়াবহ পথে যাওয়ার সময় দান্তেকে শক্তি জুগিয়েছে, স্বর্গের পানে ক্রমাগত আকর্ষণ করেছে, কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থাকেও পদে পদে মেনে নিয়েছে।

কী সেই ব্যবস্থা? মানুষের পক্ষে স্বর্গে যাওয়ার মূল শর্ত হলো আত্মজ্ঞান। আগে আত্মজ্ঞান, পরে পরম জ্ঞান। কিন্তু আত্মজ্ঞান আসবে কেমন করে? পাতকের জ্ঞানে। মরমানুষ স্বভাবতই পাপপ্রবণ যেমন তার দেহ ক্ষয়প্রবণ। তাই অস্বাস্থ্যের প্রতিকার প্রথমেই ব্যাধির নির্ণয়ে আর মরতার প্রতিকার প্রথমেই পাপের নির্ণয়ে। যেমন ব্যাধির আবাস দেহে তেমনই পাপের আবাস মনে। ভার্জিল বা মানবিক প্রজ্ঞার পরিচালনায় দান্তে প্রবেশ করেছেন নিজেরই অন্তরে। সংক্ষিপ্ত সরণি বিলোপ হলো যাজকশ্রেণীর নির্দেশিত - ধর্মানুষ্ঠানের পরিহার আর অরণ্যকীর্ণ পর্বতের অভ্যন্তরে প্রয়াণ প্রকৃতপক্ষে প্রাতিস্বিক সাধনার দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ ব্রত গ্রহণ। সেই অভ্যন্তর মার্গে যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তারা আসলে বিভিন্ন পাতকের প্রতীক। পাতক মাত্রেই কোন - না - কোন নশ্বর দেহসাপেক্ষ, সেগুলি কোনও বিমূর্ত কল্পনা মাত্র নয়, চৈতন্যের স্তরে সেগুলির পরাক্রান্ত শক্তি, মানবিক স্তরে সবিশেষ ক্রিয়া, ও সামাজিক স্তরে সেগুলির সবস্তুক - রূপ বিদ্যমান। ওই সব পাপের অধিষ্ঠানে প্রত্যেক মানুষের জীবন নিদারুণ বিয়োগান্তক উপলব্ধির দ্বারা উৎকণ্ঠিত ও উৎপীড়িত। অ্যারিস্টটল যখন বলেছিলেন আপনাকে জানবার কথা তখন তাঁর ইঙ্গিত সাধারণভাবে জীবজগতের অন্যান্য প্রজাতির থেকে বিশেষ ভাবে মনুষ্যজাতির চরিত্রের সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রতি; সন্ত অগাস্টিন যখন প্রশ্ন তুললেন : আমি কী? তখন মানবজিজ্ঞাসার থেকে আরও এগিয়ে প্রাতিস্বিক জিজ্ঞাসাকে বিদ্ধ করলেন। গ্রীকদের চেতনা মানবজীবন নিয়তির দ্বারা সীমাবদ্ধ; পশ্চিমের মহান নবজাগরণের চেতনাতে মানুষ তথা ব্যক্তি সীমাবদ্ধ নিজেরই বিশেষ দুর্বলতা দিয়ে। ''ডিভাইন কমেডি" একই সঙ্গে মানবিক ও প্রাতিস্বিক জিজ্ঞাসাতে আক্রান্ত। সেজন্যে অস্তিত্বের বিয়োগান্তক স্বরূপ দান্তের চেতনাতে সম্পূর্ণ।

রিমিনির বিকলাঙ্গ সামন্ত জিয়ানচিয়োত্তর সঙ্গে ফ্রানচেসকার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে : সেখানে দুর্ভাগ্যের উপরে ফ্রানচেসকার নিজের কোনও হাত ছিল না, কিন্তু স্বভাবের দুরন্ত সংরাগে প্রণয়ী হিসেবে সে নির্বাচিত করল দেবর পায়েওলোকে এবং জিয়ানচিয়োত্তর ক্ষেত্রে যে-বোধ প্রচ্ছন্ন ছিল তা প্রকট হয়ে উঠেছে প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ সর্গে ব্রুনেত্তো লাতিনির সঙ্গে তাঁর এককালীন অনুসারী দান্তের সাক্ষাতে। প্রগাঢ় মনীষার জন্যে ইহলোকে যিনি পূজিত ছিলেন নিরয়লোকে দারুণ নেসাকোর বেলেল্লা সোডোমাইটদের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেয়ে বিমূঢ় দান্তের মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, ''শ্রদ্ধেয় ব্রনেত্তো, এ কি! আপনি এখানে!" দান্তের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ - প্রশ্ন প্রিয়জনের দর্শন ব্রুনোত্তোর প্রথম উল্লাসকে আহত ও স্বস্থিতির দুর্গতি সম্বন্ধে সে অসাধারণ মনীষীকে শোচনীয়ভাবে সচেতন করে; তারপরে দান্তে যখন বিদায় নিলেন তখন তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের ঐকাহিকতাকে এবং সেই বিশেষ পর্বকালের বাইরের সে-সম্পর্কের জের টানার অবাস্তবতাকে স্বীকার করার দরুন দুজনেই হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত : বিশেষ করে একালে যখন অতীতের কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের একটু পরে কথা ফুরিয়ে যায় ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের নিঃশেষিত বন্ধুতা তখন বোঝা যায় ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে যে - শক্তি বিচ্ছেদ ঘটায়; বিষাদ ছাড়া তার পরাক্রমের সামনে আমরা কত অসহায়! ব্যক্তির এই সীমাবদ্ধতা বোধকরি অধিকতর বিশদরূপে অভিব্যক্ত দশটি সর্গের পরে মহান কুশীলকদের প্রসঙ্গে যেখানে অনুভব করি তাঁরা আমাদেরও ব্যক্তিগত বৈফল্যকে বহন করেছেন, যেখানে এই মর্মান্তিক সত্যকে স্বীকারে বাধ্য হই যে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব একাধারে অমোঘ ও সর্বজনীন কতগুলি নৈতিক সত্যের সঙ্গে এমন নিগূঢ় ভাবে জড়িত যার জট মোচন করা শিবেরও অসাধ্য; এবং এই স্বীকৃতিতেই ঘটে আমাদের চিত্তশুদ্ধি।

মনে রাখা দরকার যে কাহিনীর চরিত্রগুলির নয়, চিত্তশুদ্ধিটা ঘটে আমাদের, লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের। দান্তে এমনভাবে এই মহাকাব্য রচনা করেছেন, এমনভাবে অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করেছেন যাতে আমাদের প্রায় অজ্ঞাতেই, কখনও চরিত্রগুলির সঙ্গে সংযুক্ত, কখনও বা তাঁদের থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ি আমরা, কখনও তাঁদের যন্ত্রণাভোগে আমরা আর্ত, কখনও - বা তাঁদের রুদ্ধভাগ্যে আমরা চিত্তশুদ্ধ হই। প্রেম দিয়েছে দান্তেকে এমন এক অশ্রুতপূর্ব সুযোগ যার ফলে নরকের মধ্যে দিয়ে, শোধনলোকের মধ্যে দিয়ে, স্বর্গে ঈশ্বরের সন্নিধানে তিনি উপনীত হলেন। এই অপার্থিব সৌভাগ্য একা দান্তেকেই দেওয়া হলেও তিনি একান্তে তা ভোগ করেননি, তাঁর আন্তরিক অভিজ্ঞতার বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে আমাদেরকেও তার ভাগ দিয়েছেন; কিন্তু পাঠক হিসেবে আমরা যা লাভ করেছি, প্রথমে পাপজ্ঞান ও পরে আত্মজ্ঞান, তার থেকে ''ডিভাইন কমেডি"র চরিত্রগুলি, বিশেষ করে নরকের চরিত্রগুলি, বঞ্চিত থেকেছে, কেননা তাদের ভাগ্য আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছে স্ব - স্ব নির্বাচিত কর্মের দ্বারা এবং একবার যাঁদের স্থান নরকে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তাঁদের আর উদ্ধার নেই, স্বর্গীয় বিচারে প্রদত্ত শাস্তির থেকে একমাত্র তাঁদেরই নিস্তার আছে যাঁদের স্থান শোধনলোকে; আর যাঁরা এ-কাব্যের পাঠক, যাঁদের ইহজীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়নি, যাঁদের সামনে এখনও আপন কর্ম নির্বাচনের বা অনুতাপের অবকাশ অবারিত তাদের পক্ষে এ-গ্রন্থের অন্যতম তাৎপর্যকে অনুধাবন করে নরকের অন্তবাস অতিক্রমণ করা সম্ভব।

বিয়াত্রিচে কর্তৃক নিযুক্ত ভার্জিলের সঙ্গে সঙ্গে যেমন দান্তে তেমনই দান্তের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যাত্রা ত্রিলোকের ধাতৃর সমীপে। দান্তের বর্ণনার সূত্র অবলম্বন করে আমরা পাতকের শেষ সীমা পর্যন্ত চলে যায়, তার বর্ণিত চরিত্রগুলির সঙ্গে আমারও তাদের পাতকের অংশীদার হয়ে পড়ি এবং সেসব পাতকের দরুন যন্ত্রণাকে স্তরে স্তরে অর্জন করি নিজেদের সংবিতে। তারপরে শুরু হয় আমাদের অনুতাপের অর্থাৎ শোধনের পালা। আমাদের পাপজ্ঞান যত যথার্থ অনুতাপও ততই গভীর। এ - গ্রন্থের পাঠকের বেলাতে শোধনের প্রক্রিয়া হলো স্তরে স্তরে পাপজ্ঞান বর্জন তথা আত্মজ্ঞান অর্জন এবং তা আসলে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অর্থে পাঠকের চিত্তশুদ্ধি : শোধনলোকের সীমান্তে পৌঁছে বিয়াত্রিচের কাছে দান্তের অশ্রুসজল বিনীত স্বীকারোক্তিতে তাঁর অসীম অপূর্ণতা অনন্ত দুর্বলতা অপার দীনতা অতল শূন্যতা প্রকাশ পেয়েছে, আত্মাদের প্রকৃত স্বরূপকে অনুধাবনেই সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁর অনুতাপ। নেই নেতি করে আপনার নাস্তিত্ব সম্বন্ধে নিটোল নিশ্চয়তা ও সম্যক সচেতনার পরে শুদ্ধচিত্ত দান্তের সামনে খুলে গেছে স্বর্গের দুয়ার, শুরু হয়েছে প্রতি পদে বিয়াত্রিচের একা অনুসরণ, পরমজ্ঞানের পথে ক্রমান্বয় উত্তরণ, অবশেষে লক্ষ্যে উপনয়ন : অজ্ঞানের কাঁটাকে জ্ঞানের কাঁটা দিয়ে উৎপাটনের পর বিজ্ঞানলাভ।

স্বভাবতই অজ্ঞানের জগৎ প্রাসঙ্গিক খণ্ডটির তুলনাতে জ্ঞানের জগৎ প্রাসঙ্গিক খণ্ডটি নানারূপ তত্ত্বালোচনাতে পরিপূর্ণ এবং কোন কোন পাঠকের মনে হতে পারে যে সে-আলোচনা কাব্যের বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করেছে; কিন্তু গদ্য ও পদ্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কিত উনবিংশ শতকীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এলিয়টের বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য : মানুষের হৃদয় ও মস্তিস্ক জলাচল কোটরে কোটরে বিভক্ত নয় এবং মহৎ রচনা ব্যক্তির তাবৎ অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন মাত্রা - বর্ণ - রূপে - জটিলতাসহ ধারণ করে সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ। নিরয়ালোকের যথার্থ বিপরীত করে শোধনলোকের বর্ণনা দান্তে দেননি বটে, তাঁর ফলে প্রথম খণ্ডের রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়ার আকর্ষণ পরবর্তী দুটি খণ্ডেই যে অনুপস্থিত তা-ও সত্য এবং এর কারণ দান্তে স্বেচ্ছায় সর্বতোভাবে সমগ্র কাব্যের এমন স্থাপত্য পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে তিনটি খণ্ডের মধ্যে আপাত সাদৃশ্য ও অন্তর্লীন ক্রিয়া সত্ত্বেও মৌল প্রতিমানের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, যাত্রী - দান্তের উত্তরণের সঙ্গে শিল্পী - দান্তে বারবার নিজেকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে এবং যাতে প্রতিমানের সে-তারতম্য অর্থাৎ শিল্পসিদ্ধ উত্তরণ প্রতি খণ্ডের কেন্দ্রনিহিত তাৎপর্যের ইতর - বিশেষকে সুস্পষ্ট করে তোলে। সেজন্য নিরয়লোকের সঙ্গে শোধনলোকের প্রকৃত পার্থক্য দণ্ডপ্রদানে নয়, দণ্ডপ্রাপ্ত চরিত্রগুলির মনোভঙ্গিতে : মানুষ যখন পাপ করে ও তার দরুন গ্লানি থেকে মুক্ত ও পাপের কুহককেই আঁকড়ে থাকা পছন্দকরে তখন লঘুতম শাস্তিকেও সে স্বীকারে অক্ষম, সেটাকে মনে করে অসংগত অত্যাচার, অজ্ঞানবশে বুঝতে পারে না যে যে - দিব্যবিভাকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে তা-ই আগুন হয়ে জ্বলছে নরকে; পক্ষান্তরে সে যখন জ্ঞানের দৌলতে স্বকৃত পাতক সম্বন্ধে যথার্থই অবহিত তখন তার জন্যে মাথা পেতে নেয় শাস্তিকে আর আপনা থেকে তার অন্তরে সে-শাস্তি জাগায় শোধনক্রিয়া। পাতকের সম্মোহনকে অতিক্রম করার আগ্রহ যাদের নেই তাদের জন্যেই অনন্ত নরকজীবন, আর ওই আগ্রহেই অনেক পাতকীর স্থান শোধনলোকে এবং শোধিত হয়ে একদিন তাঁরা পাবেন অনন্ত স্বর্গজীবন; শোধনলোক তাঁদের একটা সাময়িক আবাসমাত্র, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, সারাবার একটা হাসপাতাল। মানুষ তখনই তো হাসপাতালে যায় যখন তার এই জ্ঞান হয় যে সে রোগের কবলে পড়েছে।

কিন্তু দান্তে যেটাকে অজ্ঞান বিবেচনা করেছেন তা আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে অচেতন জীবের অজ্ঞানতা নয়, তা অবোধ শিশু বা আদিম মানুষের অজ্ঞানতাও নয়, তা এক হিসেবে বিশেষ পরিস্থিতি ও স্বকীয় কামনার মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার প্রবৃত্তি বা প্রযুক্তি দিয়ে সাধিত সমাধান, তা ভালোমন্দ সত্যাসত্যের মধ্যে মন্দ ও মিথ্যার নির্বাচন অর্থাৎ, ব্যক্তি যখন পরমজ্ঞানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে প্রবৃত্তির তাড়নাতে বা প্রযুক্তির পরামর্শে নিজেকে চালিত হতে দেয় তখনই সে অজ্ঞানে পর্যুদস্ত হয়, আর আপন পাতকের পশ্চাতে যে যত বেশী প্রযুক্তি সরবরাহে পটু তার অজ্ঞান তত বেশী ঘন। আসলে প্রযুক্তি ও বিচারের পার্থক্য দুস্তর বললেই হয় না, বলা উচিত দুটির সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা প্রযুক্তির উৎস যেখানে অজ্ঞান সেখানে বিচারের উৎস পরমজ্ঞান এবং দুটির মধ্যে কোনটির দ্বারা ব্যক্তি নিজেকে চালিত হতে দেবে সে-প্রসঙ্গেই উত্থাপিত হয় তার আপন কর্ম তথা পারলৌকিক অবস্থান নির্বাচনের অধিকার। যে-মধ্যযুগ, সাধারণভাবে বিশ্বাস করতো যে মানুষের ইহজীবন ও পরজীবন দিব্যস্পৃহার দ্বারা পূর্ব - নির্ধারিত তার থেকে দান্তে এমন অলক্ষিতে অপসরণ করলেন নির্বাচনের বা মুক্তস্পৃহার তত্ত্বে যে সহজে তা চোখেই পড়ে না; কেননা ঈশ্বরের করুণা ব্যতীত স্বর্গে প্রবেশলাভ অসম্ভব এ - বিশ্বাসকে তিনি স্পর্শমাত্র করেননি, মধ্যযুগীয় ভাবসত্ত্বের মূল কাঠামোকে তিনি সর্বত্র স্বীকার করেছেন, কিন্তু সে সঙ্গে ঈশ্বরের করুণার জন্যে যাজকদের দ্বারস্থ হওয়ার আবশ্যকতাকে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন, তার জায়গায় ঢুকিয়েছেন সেই ব্যক্তিস্বরূপকে যা নির্ধারিত হয় ব্যক্তির সামগ্রিক বিবেচনা ও নির্বাচন করা শক্তির দ্বারা এবং এখানেই এসে পড়েছে প্রাতিস্বিক দায়িত্বের প্রশ্ন। প্রকাশ থাকে যে ওই প্রশ্ন উত্থাপনের দান্তের পক্ষে সর্বৈব অভিনবত্ব দাবি করা যায় না, কেননা মধ্যযুগের ঊষাকালেই সন্ত অগাস্টিন একই প্রশ্ন তুলেছিলেন, ''কনফেশনসে'', কিন্তু সে-প্রশ্নকে তিনি নিজেই চাপা দিয়েছিলেন ''এনকিরিডিয়নে''।

লৌকিক অস্তিত্বে অটল বিশ্বাস থেকে ব্যক্তির ভাবরূপকে প্রত্যাখ্যান করেছেন দান্তে; তাঁর কাছে ব্যক্তি ছিল সেই মূর্ত অস্তিত্ব যার থেকে হয় ভাবের উদ্ভব, বোনিফেস থেকে এসেছে ধর্ম প্রতিষ্ঠানগত পাপচিন্তা বা সন্ত টমাস অ্যাকুইনস থেকে তত্ত্বচিন্তা, এবং এই ব্যক্তি অনন্য হয়েও ইতিহাসের কাছে দায়িত্ববদ্ধ : ইতিহাস তথা মানবজীবনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের প্রতি কর্তব্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি নির্বাচন করেছে ও কোন্‌টি সম্পাদনে, ব্যক্তি সক্ষম হচ্ছে তা দিয়ে ঈশ্বর নির্ধারণ করেন মৃত্যুর পরে ত্রিলোকে তাঁর স্থান। মজা এই যে মরজীবন একবারই মানুষ পায়, আর সে-জীবনের স্থায়িত্ব মহাকালের পলকমাত্র, এর মধ্যেই তাকে অলঙ্ঘ্য দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সেই অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হয় বা নির্বাচন করতে হয় যা দিয়ে তার সমগ্র পরকাল স্থির হয়ে যায় এবং এখানেই প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও প্রযুক্তির নাগপাশে আবদ্ধ ব্যক্তির মৌল অস্তিত্ব গভীর বিয়োগান্তক তাৎপর্য বিশিষ্ট।

এবং এই তাৎপর্য আমাদের সমকালে আরও গভীর হয়ে উঠেছে। মানুষ যেদিন থেকে নিসর্গের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করে সেদিনই বোঝে যে বাইরের প্রকৃতির চাইতে ভিতরের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির প্রাধান্য কিছু কম নয়, বরং বেশি; কিন্তু একদা যেমন প্রবৃত্তির পায়ে তেমনই মধ্যযুগে প্রযুক্তির হাতে মানবজীবন মুখ্যত সমর্পিত : মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে মানুষের পর্যটন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রযুক্তির পথে এরূপ চিন্তায় আত্মতৃপ্তির অবকাশ প্রচুর হলেও সত্যের ভাগ সামান্য, আসলে উল্টোটাই সত্য এবং মধ্যযুগীয় দর্শন—হোয়াইটহেডের উক্তিতে —''সীমাহীন যুক্তিবাদ''। এই সত্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ত অ্যাকুইনস ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কান্টের অবস্থান তুলনা করলেও স্পষ্ট হয়, কেননা আলোকময় যুগের চরমে এসে কান্ট অনুধাবন করলেন যে প্রযুক্তির সীমানা কতদূর সংকুচিত, তাই তিনি বাধ্য হলেন প্রযুক্তির অর্থটাকেই পালটে দিতে অথচ ঈশ্বরকে একবার সৃষ্টির মূল হেতু বলে কল্পনা করার পরে অ্যাকুইনসের মনে হয়েছিল যে মানুষের প্রযুক্তির কাছে সমস্তই স্বচ্ছ এবং তা দিয়ে সমস্ত কিছুকেই বিদ্ধ করা সম্ভব অর্থাৎ প্রযুক্তির অতীত এক রহস্যকে জগতের উৎস বলে মেনে নেওয়ার পরে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালে প্রযুক্তিই একচ্ছত্র আধিপত্য এবং সে-আধিপত্যের পরমগতি আবার সেই রহস্যেই প্রত্যাবর্তন।

কিন্তু মধ্যযুগে মানুষের জীবদ্দশা ছিল যে - প্রযুক্তির আশ্রয়ে মহান নবজাগরণের সময় থেকে তা শিথিল হতে শুরু করে; অতঃপর ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মসংস্কারের আন্দোলন এল দস্যুর মতো—মধ্যযুগীয় মানবিক অনুভূতি আবেগ ও প্রক্ষোভ থেকে উদ্ভূত যে সব অলংকার চিত্রকল্প ও প্রতীকের সম্ভারে মানুষ সাজিয়েছিল নিসর্গকে একে একে সে সব কেড়ে নিয়ে এমন এক রূপক দিল নিসর্গকে একে একে সে সব কেড়ে নিয়ে এমন এক রূপ দিল নিসর্গের, যা সত্তার শত্রু, যাকে পরাস্ত করতে হয় কঠিন আয়াসে, এবং এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সমান্তরালে একই উদ্দেশ্য সাধনের মন্ত্র নিয়ে উন্মেষিত হলো পাশ্চাত্য ধনতন্ত্র। প্রযুক্তি তার পূর্বতন কর্তৃত্ব হারাল ধনতন্ত্রের বিকাশে, কেননা সে - কর্তৃত্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে হস্তগত করতে থাকে যন্ত্রতন্ত্রও প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তি ও প্রযুক্তির মতোই মানুষের আপন কামনারই একপ্রকার প্রকাশ। তবে প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রযুক্তি ও যন্ত্রতন্ত্রের পার্থক্য এই যে প্রথমটি যেখানে মানুষের স্বভাবগত সেখানে শেষের দুটি মানুষের দ্বারাই সংগঠিত, তাই সেখানে ব্যক্তির নির্বাচন - ক্রিয়া সহজেই জাগে এবং বিশেষ করে যন্ত্রতন্ত্রের ক্ষেত্রে তো তা স্বতঃপ্রতিষ্ঠ; কিন্তু যে - যন্ত্রকে নিজের ইচ্ছে মতো গড়েছে ও নিজের দাস বানাতে পেরেছে মনে করে মানুষ অহংকারে মাটিতে পা ফেলতে চায়নি আজ সেই যন্ত্রই চেপে বসেছে মানুষের বুকের উরর — নিজের কামনার জালেই মানুষ আজ বন্দী।

ধনতান্ত্রিক সমাজে তত্ত্বগতভাবে ব্যক্তির মূল্য এক - একটি সম্পূর্ণ একক হিসেবে, কিন্তু তলিয়ে দেখলেই সে-মূল্য নিতান্ত বিমূর্ত : আমাদের ভোটে যে-দল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রাষ্ট্র শাসন করছে তার কাছে কোনও একজন সাধারণ মানুষের অভাব - অভিযোগ অরণ্যে ক্রন্দন; বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রবণতা বড়ো বড়ো মহানগরীতে জনতা সমাবেশ করার দিকে, কিন্তু সে - জনতার মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিজন অসহায় ও নিরবলম্ব এবং সে-জনতার চাপে ব্যক্তির কর্ম - নির্বাচন যে শূন্যে পদক্ষেপ, যেমন আমরা বলতে পারিনে যাদবপুর থেকে কাশীপুর যেতে ঠিক কতক্ষণ সময় মোটর গাড়িতে লাগবে, কেননা কোন সময়ই সমান গতিতে গাড়ি চালানোর কল্পনা অবাস্তব, কোথায় কতক্ষণ আস্তে বা জোরে গাড়ি চালানো যাবে বা দাঁড়াতে হবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অর্থাৎ সামান্য চলাফেরা ব্যাপারটাও আমাদের নিয়ন্ত্রণশক্তি বা মুক্তস্পৃহার অতীত; ব্যক্তি - স্বাধীনতার উগ্র প্রচারক অস্বস্তিকর হলেও সেরকম ছাঁটকাটের পোশাক পরেন যা হালচালের অনুগামী এবং হালচালের দাবিতে বড়ো বড়ো শুঁড়িখানাতে নিতান্ত মূঢ়ের মতো আচরণ করেন; বড়ো বড়ো কল - কারখানা বড়ো বড়ো হাসপাতাল বড়ো বড়ো রেলস্টেশনে ঢুকে মনে হয় না যে এসব মানুষ হিসেবে আমার সৃষ্টি, বরং নিজেকে একা ও নগণ্য মনে হয়, নিজেকে অভিভাবকহীন অনাথ মনে হয়; এয়ারকন্ডিশনার, রিফ্রিজেটের, রেডিয়োগ্রাম প্রভৃতির উচ্চকিত উজ্জ্বল বিজ্ঞাপন নিরন্তর আমাদের মনে একটার পর একটা চাহিদাবোধ জাগাচ্ছে, তাকে প্রতিক্ষণে উসকে দিচ্ছে, আমাদের মনে এই প্রতীতির জন্ম দিচ্ছে যে এসব উপকরণ ব্যতীত মানব জন্ম অচল ও বিফল; আজকের মানুষের বিচারশক্তি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সংবাদ পত্রের দ্বারা, অধিকাংশ ব্যক্তির সঙ্গে দু দণ্ড রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলে প্রায়ই সঠিকভাবে বলা যায় যে সে কোন্ সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক, কোন্ সংবাদপত্র দ্বারা তার চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত, উপরন্তু আজকের শিক্ষিত মানুষ যদিও নানা বিষয়ে পণ্ডিত, তবু ভাত টিপলেই বোঝা যায় যে তাঁর পাণ্ডিত্য সংবাদপত্রে পরিবেশিত পল্লবগ্রাহী জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ আর যেহেতু দৈনিক পত্রিকা একটি দিনের সেবক হিসেবে দিনে দিনে সব বিষয়েই জ্ঞান বিতরণ করে তাই এই সব শিক্ষিতরাও সর্বদাই স্বল্পমেয়াদী আনকোরা জ্ঞানের ক্ষুদ্র বিশ্বকোষ মগজে নিয়ে ঘোরেন এবং সে সঙ্গে স্বাধীনচিন্তা ও সর্বজ্ঞতার বড়াই করেন।

আজকের মানুষ তাঁর স্বাশ্রয়ী ব্যক্তিস্বরূপকে অস্বীকার করে, তার প্রাতিস্বিক চেতনাকে বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তির অতীত কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সমানে নতজানু - প্রণতি জানাচ্ছে, জড়োপকরণের সন্ধানে দিগ্বিদিক হারিয়ে ছুটে চলেছে, নিজের অজ্ঞাতে ব্যক্তিত্ববিনাশী শক্তিগুলোর হাতে অকাতরে আত্মসমর্পণ করেছে: নবজাগরণের সময় থেকে ভৌতিক জগতের উপরে যে-শ্রেষ্ঠতা নিয়ে আধুনিক মানুষ জয়যাত্রা করেছিল, যে-যাত্রার সাফল্যের স্বপ্নে ঊনবিংশ শতাব্দী উদ্বেলিত, তা সহসা বিপরীত সত্যে পরিণত হলো প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আতঙ্কিত বিস্ময়ে মানুষ আবিষ্কার করল যে অভিমন্যুর মতো নির্গমনের কৌশল না জেনে ঢুকে পড়েছে মৃত্যুব্যূহে; ব্যূহবদ্ধ মানুষের অব্যক্ত ও ব্যাখ্যাতীত উৎকণ্ঠা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে এবং পরমাণু শক্তির উপরে কর্তত্ব তার মনে আশ্বাসের পরিবর্তে আশঙ্কাকেই তীব্র করেছে। অর্থাৎ মানুষ যে আজ শুধু নিজের কামনার ফাঁদে বন্দী তা-ই নয়, তার স্বাশ্রয়ী ব্যক্তি-স্বরূপ তথ্য ব্যক্তিত্ব খুইয়ে নগ্ন জান্তবতায় সে টিকে আছে মাত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি মানুষ ভৌতিক বিজ্ঞানে ও কারিগরি শিল্পের সাফল্যে এত বেশি মজেছিল যে তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার অবসর পায়নি; এই পর্বে যদি - বা গ্যেটে, কিয়ের্কেগার্ড, নীৎস, মার্কস, থোরো, টলস্টয় প্রমুখ কোনও কোনও মনীষীর মানুষের নেশা ভাঙাবার চেষ্টা করেছিলেন, তবু আত্মসমালোচনতে প্রবৃত্ত হওয়া চোরের ধর্ম নয়; কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে মানুষ গত তিন - চার শ বছর ধরে যে - পাপ করেছে তার খেসারৎ শুধু এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলোর উপর দিয়েই যাবে একথা আজ কোনও বাতুল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষেও কল্পনা করা অসম্ভব; এই পাপের দরুন স্বীকৃতি এখনও পশ্চিমে সমষ্টিগতভাবে শুরু হয়নি, যা হয়েছে তা নিতান্তই ব্যক্তিগত ও বিক্ষিপ্ত ভাবে, অথচ যতদিন না আমরা সার্বিক ভাবে যে - গ্লানি বোধ করছি ততদিন এই শতাব্দীর নিরয়লোক থেকে আমাদের উদ্ধার নেই এবং সে-উদ্ধারের অর্থ মৃত্যুর পরে শোধনলোকে নয়; ইহলোকেই নতুন সমাজ - ব্যবস্থাতে উত্তরণ, যে-সমাজব্যবস্থাই প্রবর্তিত হতে পারে না যদি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক পরিবর্তিত না হয়, যদি ব্যক্তি তার অসীম দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত না হয়; এবং দায়িত্বের স্বীকৃতি হলো জীবিকা ও জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপকে নির্বাচন করা আর সে - নির্বাচনে অধিকারটাই ঐহিক শোধনলোকে যাওয়ার জন্যে আমাদের স্বাধীনতা : প্রশ্ন হচ্ছে এই স্বাধীনতার মর্যাদা আমরা ব্যক্তিগত ভাবে প্রাত্যহিক আচরণে কতখানি রক্ষা করত পারছি—আমরা বিমূর্ত জনতার চাপে নিজেকে চলতে দিচ্ছি কি দিচ্ছি না, বিমূর্ত প্রচারে আমরা বিভিন্ন বস্তুর অভাব বোধ করছি কি করছি না, বিমূর্ত হালচালের অনুগামী হচ্ছি কি হচ্ছি না।

আধুনিক সভ্যতা মানুষকে আকৃষ্ট করছে বাইরের অজস্র উপকরণে, জীবনযাত্রার প্রদীপ্ত বাহুল্যে; নবজাগরণ মানুষের অন্তহীন যে অন্বেষণস্পৃহা জাগিয়েছিল তা আজ সাধারণ মানুষের কাছে দাঁড়িয়েছে সেই appetitus divitiarum infinitus-এ, উপকরণ ও বাহুল্য দখলের অন্তহীন অন্বেষণে, এবং সে-অন্বেষণের পথে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা নিয়ে চিন্তা করার সময় আমাদের নেই। দান্তের মতোই আজ আমরা এক অন্ধকার ভয়ঙ্কর মহাবনে পথ হারিয়ে ছুটোছুটি করছি, সুখের সংক্ষিপ্ততম পথ বেয়ে চলতে গিয়ে বহুমূত্রে ভুগছি, অত্যাধিক রক্তচাপে, হৃৎপিণ্ডের নানা ব্যাধিতে, ঘুমের ঔষধ খেয়ে প্রাণ হারাচ্ছি, কখনও ধীরে ধীরে, কখনও চকিতে আত্মহত্যা করছি, সামাজজীবন থেকে মুছে ফেলছি শান্তির সমস্ত নিশানা। আধুনিক মানুষকে দান্তে কোনও পারলৌকিক শান্তির অধিকার দিতে পারেন না সেকথা সত্যি, কিন্তু তাঁর কাব্য আমাদের প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারে, এবং প্রেমই একমাত্র সেই জিনিস যা মানুষকে অন্তর্মুখী করে প্ররোচিত করে আত্মসমালোচনাতে : আত্মমূল্যায়নে, বিয়াত্রিচে যেমন দান্তেকে করেছেন শোধনলোকের একত্রিংশ সর্গে; আর একমাত্র তখনই আমাদের অস্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণে আমরা সক্ষম হব। এক হিসেবে সেই স্বরূপ - নির্ধারণ হলো ব্যাধি - নির্ধারণ। প্রেম শুধু আমাদের অন্তর্মুখী করে না, জাগায় জিজীবিষাকে। যার জিজীবিষা আছে চিকিৎসাকে সে মেনে নেয় সহজে। তার অকাট্য দাবি শোধনলোকে। শোধনলোকে মানে শুধু হাসপাতাল নয়, তা নতুন সমাজ - ব্যবস্থাও বটে। তারপর আছে সর্বোচ্চ সমাজব্যবস্থার স্বর্গলোক; তথা শান্তিলোক, যেখানে শান্তি মানে হলো সর্বময় কর্তৃত্বের স্বীকৃতি, ''কেননা তাঁর অভিপ্রায়েই শান্তি'', অদ্বিতীয় রাষ্ট্রের অধীনে বিশ্বজনীন সমাজ যা, রাষ্ট্রহীন সমাজও সারাৎসারে তা-ই। তার মানে এই নয় যে সকলেই সে - সমাজে ব্রহ্মত্ব লাভ করবে, যেমন উপনিষদে প্রোক্ত আছে যে পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই ব্রহ্মের মায়া; পক্ষান্তরে দান্তের উপলব্ধ ঈশ্বর সর্বপূর্ণ : তাঁর পূর্ণতাকে কোনদিনই মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না, শুধু পেতে পারে সেই পূর্ণতার আস্পৃহাতে মহৎ থেকে মহত্তর হতে পারে।

লেখকের 'দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত।